# অনীক

জুন ২০১২
বর্ষ ৪৮ q সংখ্যা ১২



**সম্পাদকীয়** q ১

**ফিরে দেখা**
বিশেষণে সবিশেষ q শঙ্খ ঘোষ q ৩

**ঘটনাপ্রবাহ**
নোনাডাঙ্গায় গুণ্ডামির প্রতিবাদ q ৫
মনমোহন-আলুওয়ালিয়ারা... q ধারা চট্টোপাধ্যায় q ৬
কয়লা কেলেঙ্কারি q সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় q ৭
শহর জুড়ে ত্রিশূল আলো q মালবিকা সাহা q ৮
সোনু সোরি-কমলেশ কাহিনী q পর্যবেক্ষক q ১০
সোনি সোরির চিঠি q ১১
সাম্রাজ্যবাদের কুমীর কান্না... q দীপ্তি চন্দ q ১৩
কুয়ালালামপুর ট্রাইবুনাল q পরিচয় কানুনগো q ১৩
অভিষেক-সুরেশ— মৃত্যু না হত্যা q শ্যামল দাস q ১৫
সীমা আজাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড q ১৬
সমালোচনামূলক শিক্ষণপদ্ধতির সপক্ষে q ১৭

**পরিবর্তনের এক বছর**
কেমন আছে জঙ্গলমহল q বিশ্বজিৎ রায় q ১৮
পরিবর্তনের অন্য স্বর q অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় q ২৮

**প্রবন্ধ**
জমি অধিগ্রহণ বিল q প্রণব দে q ৩১
অভিযোগের খেলা q সি পি চন্দ্রশেখর q ৩৪

**গ্রন্থ সমালোচনা**
উন্নয়ন-এর বিকল্প q রতন খাসনবিশ q ৩৬

**কবিতা**
স্বপ্ন দেখার গল্প q দেবব্রত কর্ম্মকার q ৪০



**যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও**
**টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :**
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
**দূরভাষ :** ৯৪৩২৮৭৭৫৬০
**গ্রাহকদের যোগাযোগ :** ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
**বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা :** ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

*কার্যালয় :*
**১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯**
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

*সম্পাদকমণ্ডলী :* **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**




## চৌত্রিশ বনাম এক !

বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে একাদিক্রমে ক্ষমতায় ছিল ৩৪ বছর। আর সেই সরকারকে 'পরিবর্তন'-এর স্লোগান তুলে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মমতা সরকারের বয়স হলো মাত্র এক বছর। স্বভাবতই তাদের মধ্যে এক্ষুনি তুলনা করতে যাওয়াটা হবে অর্থহীন এবং অন্যায়। তাই সেটা আমরা করবো না—আমরা বরং শুধু এই দুই জমানার দৃষ্টিভঙ্গির ও বাস্তব কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত প্রবণতাগুলি একটু উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো।

১৯৭৭-এ পূর্ববর্তী সিদ্ধার্থ-ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের জমানার বিরুদ্ধে আজকের মতোই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান শক্তি ছিল সিপিআই(এম) দলটি। জঙ্গী বিপ্লবী কর্মীদের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে সমাজ-বিপ্লবের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেও শেষ পর্যন্ত একদা-প্রত্যাখ্যাত সংসদীয় পথেই প্রত্যাবর্তন করে মূলত একটি সমাজ-গণতন্ত্রী পার্টিতে তখন রূপান্তরিত হয়ে গেছে দলটি। ফলত বামপন্থার কিছু অবশেষ তখনও থেকে থাকলেও, ১৯৬৭-র 'সরকারকে গণআন্দোলনের ঢাল হিসেবে ব্যবহারের' তত্ত্ব বর্জন করে 'চোখের মণির মতো' সরকারকে রক্ষা করার লাইন প্রথম থেকেই কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল। তাই বামফ্রন্ট সরকার যদিও বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, শেষ পর্যন্ত তাদের 'দম' কয়েক বছরের মধ্যেই ফুরিয়ে এসেছিল। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮০-র শুরু থেকে রাজনৈতিক কর্মীদের আবার আটক ও অত্যাচার করা শুরু হয়েছিল। ভূমিসংস্কারের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ববর্তী জমানার 'অপারেশন বর্গা' কর্মসূচি বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে তাকে সীমিত ও কার্যত পঙ্গু করে রাখা হয়েছিল। ১৯৭৭-পরবর্তীকালে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে সমস্ত রাজ্যকে একজোট করে দেশের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮০-তে কেন্দ্রে ইন্দিরা সরকার পুনরাধিষ্ঠিত হতেই সেই লড়াইও পরিত্যক্ত হয়। এই সরকারের আরেকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ ছিল ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ—পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই, সিপিআই(এম) যতো বেশি সংসদীয় ব্যবস্থার বেনো জলে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হতে শুরু করে, ততোই যেন-তেন-প্রকারেন ক্ষমতা দখল করে থাকাটাই তাদের কাছে প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে, এবং সেজন্য পঞ্চায়েত-সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেই মাকড়সার জালের মতো চরম পার্টিতন্ত্রের প্রাধান্য কায়েম করা হয়, ক্ষমতামদমত্ততার চরম প্রকাশ গণতান্ত্রিক বাহ্যিক আবরণের নিচে লুকিয়ে রেখে মানুষের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর ক্রমাগত আক্রমণ শুরু হয়। এমনকি মুখে নয়া উদারনীতিবাদের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেও, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে সমঝোতা করা শুরু হয়, বিকল্প এক অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বিসর্জিত হয়। বামপন্থার এই ক্রমাগত অধঃপতনের পরিণতিতেই ব্যাপক মানুষের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ সঞ্চিত হতে থাকে।

বিগত পাঁচ-ছ' বছরে এই ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ঘটে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় প্রভৃতি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে। সেই বিক্ষোভকেই পুঁজি করে এবং সেই লড়াইয়ের ফসল আত্মসাৎ করে, এই রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েই গত বছর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস

আসলে তৃণমূল তথা তার একচ্ছত্র নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সরকারের কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল না। যা ছিল তা হচ্ছে কিছু গালভরা প্রতিশ্রুতি, আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক 'গুরু' রাজীব গান্ধী-সিদ্ধার্থ রায়-সুব্রত মুখোপাধ্যায়দের অনুসৃত পুঁজিবাদ-সামন্তবাদের স্বার্থবাহী রাজনৈতিক ঐতিহ্য। ফলত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সরকার আপাত-ইতিবাচক কিছু ভূমিকা নিলেও— (তিস্তা চুক্তি প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে বিসর্জন দিয়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরোধিতা, খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের এবং কর্পোরেট স্বার্থে পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির বিরোধিতা প্রভৃতি)— সেগুলি যে সুনির্দিষ্ট কোনো জনস্বার্থবাহী নীতির ফল, এমন প্রমাণ মেলে নি। বরং সেসবের অনেকটাই কার্যত কেন্দ্রের সাথে দর-কষাকষির ফল বলে ধরা পড়েছে। উল্টোদিকে, প্রথম থেকেই পি-পি-পি মডেলের ব্যাপক অনুসরণ, কর্পোরেট পুঁজিকে এ রাজ্যে তাদের ব্যাপক মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার আমন্ত্রণ প্রভৃতি তাদের কংগ্রেসি নয়া উদারনীতিবাদের ঐতিহ্য বহনেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তুলে ধরছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের উচ্ছিন্ন মানুষদের সমর্থনের ভিত্তিতে যে দলটি পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছিল, এখন শুরু থেকেই তারা সেই উচ্ছেদের আগ্রাসী কার্যক্রমের রথে চড়ে বসে এ কথারই যথার্থতা প্রমাণ করে দিচ্ছে। কলকাতাকে লন্ডন বানাতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ করা হচ্ছে।

বন্দীমুক্তি, জঙ্গলমহলে শান্তিপ্রতিষ্ঠা, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার, কালা কানুন ব্যবহার না করা প্রভৃতি যে সব প্রতিশ্রুতি ভোটের সময় নতুন সরকারের ক্ষমতাসীন হবার পথে সহায়তা করেছিল, তার প্রায় প্রতিটিই নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করা হচ্ছে। সিপিআইএর মডেলের অনুসরণে জঙ্গলমহলে হার্মাদবাহিনীর স্থান নিয়েছে ভৈরববাহিনী, পুলিশ-প্রশাসনকে একই কায়দায় কাজে লাগানো হচ্ছে বিরোধীদের বিরুদ্ধে। ছত্তিশগড় মডেলে গ্রামের মানুষের উপর পুলিশি নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রামের মানুষকেই কাজে লাগানো হচ্ছে। তার উপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ফর্মুলা অনুসারে ৩৩৪১টি গ্রামপঞ্চায়েতে ৩১০ টাকা দৈনিক (অর্থাৎ মাসিক ন'হাজারের বেশি) মাইনেতে নতুন করে চৌকিদার নিয়োগ করা হচ্ছে, যাতে তারা 'পুলিশের চোখ ও কান হিসেবে' কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, এই রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি কার্যকর করা দূরের কথা, পূর্ববর্তী জমানায় গণতন্ত্র হরণের প্রক্রিয়া যতোটা কার্যকর হয়েছিল, এই রাজ্যে প্রথম থেকেই নতুন সরকার ও তার প্রধান দল তার থেকেও অনেক বেশি তীব্রতা নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। আগের আমলে প্রধান শাসক দল তাদের সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী পার্টি-কাঠামো দিয়ে যতোটা সম্ভব সূক্ষ্মভাবে সে কাজটি করার চেষ্টা করতো, যদিও শেষ দিকে সমাজবিরোধী ও নীতিহীন সুবিধালোভীদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ সেটাকে ক্রমশ অসম্ভব করে তুলেছিল। আর বর্তমান আমলে, ন্যূনতম গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক কাঠামোর অনুপস্থিতি একদিকে সরকারকে অনেক বেশি আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে; অন্য দিকে, সামান্যতম নীতিবিহীন দলীয় কর্মীরা যা-খুশি তাই করার স্বাধীনতা পেয়ে গেছে। আগের জমানায় গ্রামাঞ্চলে যা-ই হোক না কেন, অন্তত শহরাঞ্চলে মতামত প্রকাশের অধিকারের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনার ব্যাপারে শাসকেরা কিছুটা সংযত থাকার চেষ্টা করতো। বর্তমানে ঠিক তার উল্টোটাই ঘটছে। পুলিশ ও প্রশাসনকে এক বছরের মধ্যেই আগের জমানার চেয়েও বেশি দলীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন করে নেওয়া হয়েছে। নারীদের উপর অত্যাচার ও ধর্ষণের, জবরদখলের ও গায়ের জোরে টাকা আদায়ের, এবং পুলিশের হাত গুটিয়ে থাকার প্রতিযোগিতা প্রথম থেকেই অনেক বেশি তীব্র। মুখ্যমন্ত্রী যা বলবেন, সেটাই এখন এ রাজ্যে আইন, মানুষের করণীয়। তার বিরোধিতা করলেই কী হবে, প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই তার প্রমাণ মিলে যাবে। একটু প্রতিবাদী বা নিরপেক্ষ বা বিরোধী মতামত যাতে প্রচারিত না হতে পারে, সেজন্য সারা রাজ্যের গ্রামীণ পাঠাগারগুলি কী পত্রিকা নেবে সেটাও সরকার ঠিক করে দিচ্ছে। সাধারণত প্রতিবাদী লিটল ম্যাগাজিনগুলি যাতে বিপদে পড়ে, সেজন্য তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান জমানায় মাত্র এক বছরে মতামতের কণ্ঠরোধের যে ক্ষমতা দেখিয়েছে, আগের জমানা ৩৪ বছরেও সম্ভবত ততোটা করতে পারেনি! তার উপর, মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে একদিকে তাদের আর্থিক সংকটের কথা তার স্বরে তুলে ধরছেন, অন্য দিকে তাদের সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকদের দু'হাতে বিবিধ উপঢৌকনে বিলি করে চলেছেন। কেন্দ্র থেকে কোনো আর্থিক সহায়তা না পেয়েই সরকার প্রায় প্রতি মাসেই রহস্যজনকভাবে 'লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান' করে ফেলছে, কিন্তু অনেক কষ্ট করেও তার স্পষ্ট তথ্য মিলছে না। প্রতি দিন অসংখ্য 'উন্নয়ন' প্রকল্পের কথা ঘোষিত হচ্ছে, কিন্তু সেগুলির টাকা কোথা থেকে আসবে, তা রহস্যের আড়ালে ঢাকা থেকে যাচ্ছে।

কাজেই, তুলনার প্রশ্ন বাদ দিয়ে দুই জমানার দৃষ্টিভঙ্গির ও বাস্তব কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত প্রবণতাগুলি থেকে ধরা পড়ছে বামফ্রন্ট সরকার কিছুটা নীতিভিত্তিক পথে যাত্রা শুরু করেও কার্যত শেষ পর্যন্ত উল্টোরথের যাত্রীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর এই সরকার প্রথম থেকেই দৌড়েতে শুরু করেছে কার্যত গণস্বার্থ-বিরোধী সর্বনাশের পথে। ফলত শেষ বিচারে, কেউ কারও বিকল্প হতে পারে না, সেরকম ভাবাটাই হবে টুইডিলডি আর টুইডিলডামের খেয়োখেয়িতে জড়িয়ে পড়া। যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে সঠিক নীতি ও কৌশলভিত্তিক তৃতীয় কোনো বিপ্লবী শক্তি ভূমিকা— এখনও পর্যন্ত যার বাস্তব সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত অধরাই রয়ে গেছে।

**ফিরে দেখা**

# বিশেষণে সবিশেষ

**শঙ্খ ঘোষ**

সম্প্রতি মারা গেলেন একদা-'বিখ্যাত' পুলিশ অফিসার রঞ্জিত গুপ্ত। তার 'খ্যাতি'র মূল উৎস ছিল সত্তরের দশকে সিদ্ধার্থ রায়ের জমানায় নকশালপন্থীদের সুপরিকল্পিতভাবে সাংবিধানিক সমস্ত বিধি লঙ্ঘন ও আইনকানুন ভঙ্গ করে ব্যাপক হত্যা করার প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করা। অথচ সে কথা মূলত চেপে গিয়ে 'বিখ্যাত অ্যানথ্রোপলজিস্ট' ও 'দক্ষ' পুলিশ অফিসার হিসেবে তাকে তুলে ধরে বিভিন্ন সংবাদ-মাধ্যমে যেভাবে তাকে নিয়ে স্তুতি ও প্রশংসার বন্যা বয়ে গেল, তা অনেকেরই মনে বিবমিষা সৃষ্টি করেছে। ১৯৭৭-পরবর্তীকালে জ্যোতির্ময় দত্তের পত্রিকাতে তাকে একই ভাবে তুলে ধরা উপলক্ষে কবি শঙ্খ ঘোষের একটি পত্রাঘাতের বক্তব্যটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায়, সেই চিঠিটি আমরা পুনঃপ্রকাশ করছি।

প্রিয় জ্যোতি, 'কলকাতা দুহাজার' এর শরৎ-সংখ্যাটি হাতে তুলে দিলেন সেদিন এবং পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখার প্রতিশ্রুতি আদায় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন ক্ষিপ্র পদক্ষেপে। আকর্ষণ করবার মতো কোনো-না-কোনো রচনা থাকবেই এ পত্রিকায়, এই বিশ্বাসে পাতা ওল্টচ্ছি আপনার নিষ্ক্রমণের ঠিক পরেই, এমন সময়ে চোখ এসে নিবদ্ধ হলো 'লেখক-পরিচিতি'র পাতায়, যেখানে লেখা আছে : 'হ্যাঁ, এই সনেট-অনুবাদক রঞ্জিৎ গুপ্তই হচ্ছেন সেই নকশাল দমনকারী পুলিশ কমিশনার, পোলো ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, নৃতাত্ত্বিক, চাষী এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিস্ট রঞ্জিত গুপ্ত আই পি।'

এই লেখকের নাম অবশ্য আপনার পত্রিকায় প্রায় নিয়মিতই দুভাগে ছাপা হয়, বার্ষিক সাহিত্যসংখ্যায় প্রচ্ছদের এপিঠে-ওপিঠেও যেমন ছিল রঞ্জিৎ আর রঞ্জিত, যদিও আশা করি লেখক নিজে 'রঞ্জিত' বানানেই লেখেন, 'রঞ্জিৎ' নয়। কিন্তু বানান দেখেই যে চোখ এখানে থমকে গেল এমন নয়, ভাবনাটা আলোড়িত হলো পরিচয় জানাবার বিশেষ এই পদ্ধতিতে, বিশেষণের এই মর্মান্তিক নির্বাচনে, এই সগৌরব ঘোষণায় যে ইনিই সেই নকশাল-দমনকারী পুলিশ অফিসার। কয়েকমাস আগে ইলাস্ট্রেটেড উইকলি-র ধারাবাহিক দুই সংখ্যায় এই দমনের কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘাময় বিবরণ যে লিখেছেন রঞ্জিত গুপ্ত, তা নিশ্চয়ই আপনার অজানা নয়। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা হলো এক কথা, আর আপনার কলমে তার নির্যাস ভেসে-আসা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। অনুমান করি যে এ-উল্লেখে আপনি বোঝাতে চেয়েছেন শুধু লেখকের বৈচিত্র্যটুকুই, এমনকি হয়তো আত্মবিরোধটাই, পোলো খেলা এবং নকশাল-দমনের এই চমকপ্রদ সহাবস্থান, বিবরণে সম্পূর্ণতার গরজ ছাড়া ওখানে নিশ্চয় আর কোনোরকম অতিরিক্ত অভিপ্রায় কাজ করেনি। অথচ এই কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ যে মুহূর্তমধ্যে আমার মতো অনেক পাঠকের সামনে ঝাঁপ দিয়ে ওঠে এক বিযাক্ত ছোবল নিয়ে, সেকথাও সত্যি। হতচকিত আমাদের মনে হয় যে কথাটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল যেন ওই বিশেষণটির প্রতি সম্পাদকের কোনো অনাবিল প্রশ্রয়, সস্নেহ সমর্থন।

নকশালপন্থার আপনার কিছুমাত্র আস্থা থাকবার কথা নয়। তাই, যদি তার দমনকারী বিষয়ে এমন কোনো প্রশ্রয় বা সমর্থন প্রকাশ পেয়েও থাকে, তাতেই-বা আমাদের কী বলবার আছে? আপাতত মনে হতে পারে, কিছু নয়। কেবল, ওই 'দমন' শব্দটি শুনবার সঙ্গে সঙ্গে পনেরো বছরের পুরোনো ছবিগুলি আবার জেগে উঠতে থাকে আমাদের চোখের সামনে, জেগে ওঠে কত-না স্বজন বন্ধু ছাত্র-ছাত্রী অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের মুখ, আমার আপনার সকলেরই বেশ চেনাজানা, কিছু-বা সংকল্পে উজ্জ্বল, কিছু-বা নির্যাতনে বধির, যারা অনেকেই হয়তো বিভ্রান্ত ছিল সেদিন, কিন্তু যাদের আর্ত কল্পনার সামনে ছিল মস্ত এক সুস্থ দিনের স্বপ্ন। পুলিশ কমিশনার হিসেবে রঞ্জিত গুপ্তেরও মনে হয়েছে যে এদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য যা দরকার তা হ'লো 'civilised police action and coercion with humanity'। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি-র পাতায় সভ্যতা আর মানবতার এই শব্দদুটি যখন আজ পড়ি, তখন মনে পড়ে বেলেঘাটার কথা, বরানগরের কথা, দমদম আর বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের অন্তর্গত নৃশংস আর অবাধ হত্যাকান্ডের কথা, মানবতাকেই যার প্রধান ভিত্তি বলে বিবেচনা করা শক্তই ছিল সেদিন। দমনের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলি কি আজও কিছু কিছু মনে পড়ে আপনার?

আপনি না বললেও অন্য কেউ হয়তো বলতে পারেন যে বীভৎসতা তো ছিল উলটো দিকেও। খতমের সেই রাজনীতি কি শ্রেণীশত্রু নিধনের নামে একটা অরাজক বিশৃঙ্খলাই তৈরি করে তোলেনি? তারও নির্মমতা কি ভাববার নয়? প্রশাসনের দিক থেকে শৃঙ্খলার দাবিতে কিছু দমন কি তাই প্রত্যাশিতই নয়?

কী হয়েছিল সেই দমনের প্রক্রিয়া, সেটা ভাববার আগেও অবশ্য লক্ষ করা দরকার এই বিশৃঙ্খলার চরিত্রটা। এরও একটা ইতিহাস আছে। নকশালপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে, যে-কোনো কৌশলেই হোক, মিশে গেল লুম্পেন প্রোলিটারিয়েটরা। আবার লুম্পেন প্রোলিটারিয়েটদেরই প্রয়োগ করা হলো এদের ধ্বংস করবারও কাজে, এর বিবরণ আজ রঞ্জিত গুপ্ত নিজেই বলছেন। কিন্তু তার বিবরণে তিনি স্পষ্টত বলেননি জেল বা



Unfiled Notes Page 3

জেলের বাইরে সেই রাজনৈতিক ছেলেমেয়েদের কথা, যারা লুম্পেন নয়, ওই ফাঁদে জড়িয়ে নিয়ে যাদের ওপর পুলিশি মত্ততা চলেছিল উৎকট হিংস্রতায়। উনিশশো সত্তর সালের জুলাই থেকে পুলিশ কমিশনার হন রঞ্জিত গুপ্ত, আর আমাদের মনে পড়ে সে বছরেরই নভেম্বরের এক ভোররাত, যখন বেলেঘাটার পাঁচশো বাড়িতে হানা দিয়ে চুয়াল্লিশটি পুলিশভ্যান টেনে বার করে কিছু স্কুলকলেজের ছাত্রকে, আর প্রমাণহীন বিচারহীন ভাবে চারজনকে গুলি করে মেরে ফেলে সেখানেই, প্রকাশ্য অঞ্চলে। শ্যামপুকুর পার্কের কাছে চোদ্দ বছর বয়সের টাইফয়েড-আক্রান্ত একটি ছেলেকে পথে নিয়ে এসে দিনের আলোয় খুন করে পুলিশ, শ্যামপুকুর রোডে ডেপুটি কমিশনার নিজেরই হাতে গুলি করেন দুজনকে, বেলঘরিয়াতেও ঘটে একইরকমের ঘটনা। আর এসব জানিয়েছেন সেদিন লোকসভার সদস্যদের এক তদন্তকারী দল, যে-দলের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমেনন, হীরেন মুখোপাধ্যায়, অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বা জ্যোতির্ময় বসুরা। সে-তদন্তে এ খবরও তাঁরা জানিয়েছেন যে প্রতিটি মধ্যরাতে পুলিশ শ্মশানঘাটে নিয়ে আসে চৌদ্দ থেকে তিরিশ বছরের অন্তর্গত অসংখ্য যুবাকিশোরের দগ্ধ শরীর, এই তথ্য বিষয়ে তাঁরা অবহিত। অথবা ভাবুন একাত্তর সালের চব্বিশে ফেব্রুয়ারিতে বহরমপুর জেলের কথা। বেয়নেট আর লাঠি দিয়ে চারজনকে পিটিয়ে মারা হয় সেলের অভ্যন্তরে, তিনজনের মৃত্যু হয় হাসপাতালে পৌঁছে, আরো একজন পরে। দমদম সেন্ট্রাল জেলে একইভাবে হত্যা করা হলো একদিন ষোলটি ছেলেকে, আহত আরো অগণ্য। কিংবা ভাবুন বরাহনগরের-কাশীপুরের সেই হিংস্র আরণ্যক দিনদুটির কথা, বারো আর তেরোই আগস্ট, যখন তালিকা চিহ্নিত করে দেড়শো ছেলেকে খুন করা হলো বাড়ি বাড়ি ঘুরে, পথের মোড়ে লট্‌কে দেওয়া হলো নাম, সকলের অভিজ্ঞতার সামনে, যেন প্রশাসনহীন জগতে। প্রতিবাদে বনধ্ ডাকবার কথা ভেবেছিলেন সেদিন জ্যোতি বসু, শেষ পর্যন্ত সেটা ঘটেনি যদিও।

মৃত্যু অবশ্য কখনো কখনো ত্রাণ। খুন করা হয়নি যাদের, তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচারের বিবরণ হয়তো-বা নাৎসি ক্যাম্পের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, মেয়েদেরও যেখানে নগ্ন করে উলটোভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দিনের পর দিন, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অত্যাচারে ভরে দেওয়া হয়েছে শরীর। 'চিৎকার করবে না, ওদিকের দেওয়ালের দিকে দুজন দাঁড়িয়ে আছে, ওদের হাতে সিগারেট। চিৎকার করলে তোমার শরীরে কিছু কিছু চিহ্ন স্থায়ী হয়ে যাবে। এই চিহ্ন পরে অনুধাবন করতে গিয়ে কিছু আত্মহত্যা করেছে, কিছু পাগল হয়ে গেছে, এ সংবাদ আমাদের কাছে আছে।' না, এ বিবরণ নকশাল-দমন বিষয়ে নয়, 'কলকাতা দু-হাজার'-এর ওই একই সংখ্যার 'ভূ-নয়না' কাহিনী থেকে উদ্ধৃত এই বাক্যাবলি— কিন্তু কী চমৎকার মানিয়ে যায় আমাদের সেই পুরোনো ইতিহাসেরও সঙ্গে! 'যে বিপ্লব ব্যর্থ হলো' শিরোনামে রঞ্জিত গুপ্তের লেখাটি শেষ হয়েছে এইভাবে যে নকশালপন্থী তত্ত্বচিন্তার আর অভ্যুদয়ের কোনো চিহ্নই আর টিকে নেই পশ্চিমবঙ্গে, আছে কেবল মাসিক পেনশন নেবার জন্য পুলিশবিধবাদের লম্বা কিউ। আর আছে সেইসব বাড়ি, অল্পবয়সীরা উধাও হয়ে গেছে যেসব বাড়ি থেকে : যাদের কেউ-বা লুকিয়ে আছে বিচারের ভয়ে, অন্য দলের হাতে মারা গেছে কেউ, নিজেদেরই দলের হাতে নিঃশেষ হয়েছে কেউ-বা। ঠিক, কিন্তু লুপ্ত হয়ে যাবার এই সংহত বর্ণনায় বর্জিত হলো তাদের কথা, যারা অনেক শারীরিক আর মানসিক পঙ্গুতার চিহ্ন নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে পরে, 'কিছু আত্মহত্যা করেছে, কিছু পাগল হয়ে গেছে' ওই গল্পের ভাষায়, অথবা যারা গারদের ভিতরে রয়ে গেছে আজও কোনো সুদূর বিচারের প্রতীক্ষায়।

পরিচয়সূত্রে 'পোলো ক্লাবের প্রেসিডেন্ট' কথাটা লিখবার সময়েও কি রঞ্জিত গুপ্তের প্রবন্ধটির কথা ঈষন্মাত্রায় লক্ষ্যে ছিল আপনার? বিপর্যস্ত বিড়ম্বিত অস্থির সেদিনকার পরিবেশে নির্বাচন সম্ভবপর হবে কি না, সেটা বুঝবার জন্য যখন কলকাতায় এসেছিলেন মানেক্‌শ এবং মন্ত্রণাঘরে সকলেরই সুরে যখন ধ্বনিত হচ্ছিল শুধু 'না', পুলিশ কমিশনার তখন জোর দিয়েই বলেন যে এপ্রিলে নির্বাচন হবার কোনোই বাধা নেই। আর ঠিক তার পরেই, লিখছেন তিনি, Equally seriousely I added 'But we need nine polo horses at once, we have very few, I'm afraid'। এই সময়ে যখন পোলো খেলবার কথাও ভাবতে পারছেন ইনি, তখন নির্বাচন যে অবশ্যই সম্ভব সেটা জানিয়ে দিয়ে চলে গেলেন মানেক্‌শ আর তাঁর দলবল। নির্বাচন হলো। কিন্তু একটা রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তার যে এইভাবে অবসান হয়ে গেল, এটা ভাবা হয়তো ভুল। পোলোর দিক থেকে চোখ সরিয়ে আনলে এই পঁচাশি সালে এত নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে সেই বিপ্লবী চিন্তার বা তার ইতিহাসের সব রেশ নিঃশেষ হয়ে গেছে। রঞ্জিত গুপ্ত তাঁর লেখায় এই আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালীর মানস-প্রবণতার অতীত সূত্রগুলিকে মিলিয়ে দেখেছেন সংগতভাবেই, আর আজ কি আমরা ধরে নেব যে সেই প্রবণতার একেবারে সর্বস্বান্ত বিনাশ ঘটে গেল? দেশের কোণে কোণে তাকিয়ে দেখলে সে-কথাটাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করা শক্ত। দমনকারী হিসেবে অতটা আত্মতৃপ্তিরও তাই কোনো কারণ দেখি না।

আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন যে নকশালপন্থার সমর্থন বা অসমর্থন আমার এই চিঠির বিষয় নয়। একথা আমরা সবাই আজ জানি যে ওই পন্থারও আছে হাজার উপপথ, জানি যে খতমের সেই বিশেষ রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সেদিন নকশালপন্থীদের অনেকে। অসিত সেন, সুশীতল রায়চৌধুরী, চারু মজুমদার, অসীম চ্যাটার্জিদের পারস্পরিক বিতর্কের কথাও

একেবারে অজানা নয়। তখন এবং এখনো নানারকমের মত আর মতান্তরে সামাজিক বিপ্লবের কথা ভেবেছেন/ভাবছেন নিশ্চয় অনেক, নকশালপন্থী হিসেবে, কিংবা একেবারে তার কোনো বিপরীত পথে। এর কোনোটির প্রতি আমাদের সমর্থন থাকতে পারে, কোনোটির প্রতি-বা তীব্র অসমর্থন। কিন্তু শৃঙ্খলার অজুহাতে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের নামে যখন একটা প্রজন্মকে বিকৃত বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয় পুলিশের অন্ধকার গুহায়, তখন তার বিরুদ্ধে যদি আমরা সরব হতে নাও পারি, তার সপক্ষে যেন আমরা কখনো না দাঁড়াই। এতটুকু ধিক্‌কার যেন আমাদের অবশিষ্ট থাকে যা ছুঁড়ে দিতে পারি সেই জেলপ্রাচীরের দিকে, যার অভ্যন্তর ভরে আছে বহু নিরাপরাধের রক্তস্রোত আর মাংসপিণ্ডে, ব্যক্ত আর অব্যক্ত বহু আর্তনাদের স্তরান্বিত ইতিহাসে। ব্রিটিশদের কাছে, রঞ্জিত গুপ্ত লিখেছেন, ক্রাইম ছিল দুরকমের : রাজনৈতিক আর অরাজনৈতিক। সেই একই ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন মাত্রকেই ক্রাইম বলে চিহ্নিত করতে চায় যে পুলিশ, তার দানবিক দমনের দিকে কিছু প্রতিরোধ অন্তত প্রযোজ্য, কোনো প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত সেখানে ভয়াবহ। মনে কি পড়ে 'কলকাতা দুহাজার' এর ওই সংখ্যাতেই অজিতকুমার মিত্র লিখেছেন এক রাধাচরণ প্রামাণিকের কথা, 'যার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ৭ বছর কারাদণ্ড হয়, এবং যে ঐ জেলেই, তিন বছর পরে, পাগল অবস্থায় মারা যায়'? লেখা হয়েছে 'এই রাধাচরণের আবক্ষ মূর্তি যে মুদ্রিত করবেন, তারও অবকাশ রাখেনি, বিদ্রূপময় ইতিহাস', কেননা তার কোনো ছবি নেই। ব্রিটিশ ভারতের সেই দিনের পঞ্চাশ-ষাট বছর পরেও ইতিহাসের বিদ্রূপ কিন্তু থামেনি, রাধাচরণের মতো অনেক কিশোর পনেরো বছর আগে নামহীন চিহ্নহীন লুপ্ত হয়ে গেছে এই দেশে, কেবল একটা স্বপ্নকে ভালোবেসেছিল বলেই।

সামান্য একটি শব্দের উপলক্ষ নিয়ে একটু বেশি বলা হয়ে গেল বোধহয়, ভাবছি এখন। কিন্তু হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন যে নিতান্ত সামান্য নয় ওই শব্দের নিহিত সম্প্রসার, সামান্য নয় দীর্ঘকাল জুড়ে স্মৃতির মধ্যে বয়ে বেড়ানো বিরাট একটা-সময়ের সেই ক্ষত, আমার আপনার সকলেরই। বিশ্বাস হয় না যে এ নিয়ে কোনো মতভেদ হবে আমাদের, নিছক লঘুভাবেই নিশ্চয় শব্দটি উঠে এসেছিল আপনার কলমে। সেটা অনুমান করেও যে এতখানি লিখলাম সে কেবল এইটুকু বোঝাবার জন্যে যে কোনো-কোনো শব্দ কেমন অতর্কিতে এসে আঘাত করতে পারে কোনো পাঠকের চেতনায়, কীভাবে তাতে আবর্তিত হয়ে উঠতে পারে বাস্তব অবস্থান বিষয়ে আমাদের চারপাশের ধারণা। এই মুহূর্তে, এ ছাড়া আমার আর লিখবার কিছু নেই।

ভালোবাসা জানবেন।

## নোনাডাঙ্গায় উচ্ছেদের এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের উপর গুণ্ডামির প্রতিবাদ

নোনাডাঙ্গায় উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গত কয়েক মাস ধরে যে উচ্ছেদ হওয়া মানুষেরা লড়াই চালাচ্ছেন, আজ ১৫ জুন শাসকদল তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী তাদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছে। সেখানকার বহু মানুষ, নারী ও শিশু তাদের আক্রমণে আহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন সেখানে উপস্থিত *সংবাদ মন্থন*-এর একজন সাংবাদিকও। উল্লেখ্য যে, আজই আনন্দবাজার পত্রিকা খবর দিয়েছে, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম নোনাডাঙ্গার যে সব মানুষেরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সেখানে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তাদের গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছেন।

গণতান্ত্রিক অধিকারের বিরুদ্ধে এধরণের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছেও এরকম উচ্ছেদ ও গুণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার আবেদন জানিয়ে, এবং সরকারের কাছে উচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের পুনর্বাসন ও তাদের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া সব মিথ্যে মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন *মহাশ্বেতা দেবী, অশোক মিত্র, সুনন্দ সান্যাল, তরুণ সান্যাল, কবীর সুমন, কৌশিক সেন, নবারুণ ভট্টাচার্য, সব্যসাচী দেব, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, সৃজন সেন, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, মেহের ইঞ্জিনিয়ার, নব দত্ত, মীরাতুন নাহার, রতন খাসনবিশ, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, সলিল বিশ্বাস, বিপুল চক্রবর্তী, সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন দত্ত, দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, অমিতদ্যুতি কুমার, মানস জোয়ারদার, তাপস চক্রবর্তী, কুমার রাণা, সুমিত চৌধুরী, পার্থসারথি রায়, প্রণব দে, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, রবীন চক্রবর্তী, সুমিত্র পুরকায়স্থ, সৌম্যব্রত গুহঠাকুরতা, রণেশ রায়, প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, দীপংকর চক্রবর্তী প্রভৃতিরা।*



Unfiled Notes Page 5

# মনমোহন-আলুওয়ালিয়ারা শুনছেন!

**ধারা চট্টোপাধ্যায়**

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তারা প্রতিটি দেশে সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা যাতে বজায় থাকে এবং তা আরো বেশি সম্প্রসারিত করা যায় সেজন্য সমস্ত দেশকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানাবে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, চেষ্টা করলেই সব দেশ সমস্ত নাগরিকদের জন্য এই ব্যবস্থা করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তারা এ ব্যাপারে কেপ ভার্দির সাফল্যের কথা বলেছে। নিম্ন-সাহারার দেশ কেপ ভার্দি মোটেই তেমন উন্নত দেশ নয়। সেদেশে এখনও ২৬.৬ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, রয়েছে প্রচুর সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যও। সামাজিক সুরক্ষাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও গত দু'দশক ধরে সেই দেশটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই অঞ্চলে সামাজিক সুরক্ষা ও সার্বিক (অর্থাৎ মুষ্টিমেয়র নয়) প্রগতি বিচারে কেপ ভার্দিই এখন সবচেয়ে এগিয়ে আছে।

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মতো সেদেশেও বেশির ভাগ মানুষ কাজ করেন গ্রামীণ ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে। ফলত তারা কোনো রকম কন্ট্রিবিউটরি পেন্সন না পেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েন। বয়স্ক মানুষদের এই বিপন্নতা থেকে বাঁচাবার জন্য সরকার বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য এক ধরনের সামাজিক পেন্সন চালু করেছেন। পাশাপাশি সরকারের এই সমর্থনযোগ্য কাজে সহায়তা করার জন্য আইএলও-ও সামাজিক বিপন্নতা-ও-দারিদ্র্য-বিরোধী বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতা করছে। ফলত সেদেশে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীরা, গ্রামীণ ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে ৬০ বছর বয়সে অবসর নিলেই প্রতি মাসে সেদেশের মুদ্রায় ৫ হাজার এস্কুডো (৬৫ মার্কিন ডলার বা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভারতীয় টাকা) পেনসন পান।

দুনিয়াব্যাপী বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান সংকটাচ্ছন্ন পরিবেশে এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত আইএলও-পরিচালকরা গত ৩০ মে থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত জেনেভায় ১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রমসম্মেলনে কেপ ভার্দির এই ইতিবাচক দৃষ্টান্তকে এখন বিভিন্ন দেশের সামনে তুলে ধরার এবং সাধ্যমতো তা অনুসরণের সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সভার সভাপতি তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেছেন: "এটা হচ্ছে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার দায়বদ্ধতা, যেখানে সমস্ত দেশের কোটি কোটি নারী-পুরুষ ও শিশু ক্রমশ প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে— *সমতার ভিত্তিতে*।"

বিশেষভাবে উল্লেখ্য এটাই যে, আইএলও কিন্তু কোনো বামপন্থী-মনস্ক সংগঠন নয়, বরং রাষ্ট্রসংঘেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এবং তারা যখন যথাসম্ভব 'সমতার ভিত্তিতে' একটি পিছিয়ে-থাকা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে অনুসরণযোগ্য বলে তুলে ধরছেন, ঠিক তখনই বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ প্রভৃতি কয়েক দশক ধরে জোর দিচ্ছে এমন একটি নয়া উদারবাদী পন্থার উপর, যার চলমান বিশ্বায়ন কর্মসূচি অনুসরণের বাস্তব পরিণতি দাঁড়াচ্ছে কোটি কোটি মানুষের সর্বনাশ করে কয়েক লক্ষ মানুষকে কোটিপতি বানানো। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করছে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। সাথে সাথে, সম্ভবত 'কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ' হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তো বটেই, এমনকি সম্প্রতিকালে উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলি পর্যন্ত গভীর সংকটের চোরাবালিতে নিমজ্জিত হচ্ছে।

আর আমাদের ভারতীয়দের ট্র্যাজেডি হচ্ছে এটাই যে, আমাদের দেশের দল-মত-নির্বিশেষে সমস্ত শাসক দলগুলিরই মডেল হচ্ছে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-প্রণীত সেই সর্বনেশে কর্মসূচি, দু' দশক আগে যার সূচনা হয়েছিল বিশ্বব্যাংক-এর পূর্বতন চাকুরে মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে। আইএলও-র এই নিবন্ধে আলোচিত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কাছে গুরুত্বহীন। মনমোহন ও বিশ্বব্যাংকে তাঁর একদা-সহকর্মী এবং বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিকে পুরোপুরি বিশ্বায়নের পথে পরিচালিত করারর 'মহান' লক্ষ্যের সহযাত্রী আলুওয়ালিয়া, চিদাম্বরম প্রভৃতিরা বরং সেই সর্বনেশে কর্মসূচি অনুসারে সংস্কারের প্রকল্পগুলি আরো দ্রুত গতিতে কার্যকর করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। সমস্ত কিছুকেই তাঁরা বাজারের নিয়মে পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর, এমনকি শিক্ষা, চিকিৎসা, পরিবহণ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রগুলিকে পর্যন্ত। সংকটগ্রস্ত কর্পোরেট সেক্টরকে ঘনায়মান ক্রমবর্ধমান বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা সবরকমভাবে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে চান, তাদের 'বেল আউট' করতে চান হাজার হাজার কোটি টাকা ঢেলে— গরিব মানুষদের বিরাজমান সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত প্রচলিত রীতি-নীতিকে ক্রমশ সংকুচিত করে। নির্বাচনী স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তাদের দল অবশ্য মাঝেসাঝে চলমান বিশ্বায়ন কর্মসূচির গতি একটু শ্লথ করতে বাধ্য হয়, এবং তখনই মনমোহন-আলুওয়ালিয়া অ্যান্ড কোম্পানি এবং তাদের বশংবদ সংবাদ-মাধ্যম ও অর্থনীতিবিদরা চেঁচামেচি শুরু করে দেন— যাতে সেই কর্মসূচির গতি দ্রুততর করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের তথা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সেই সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তাঁবেদাররা কি আইএলও-র কথা আদৌ শুনছেন?

**তথ্যসূত্র**

*ILO_ONLINE@ilo.org*/'Cape Verde: How social protection can help'

# কয়লা কেলেঙ্কারি : ইউ পি এ-র বৃহত্তম দুর্নীতি

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

দুর্নীতিতে নিজর রেকর্ড নিজেই ভাঙছে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার। টু-জি, কমনওয়েলথ... এসবের পর ফের এক মহা-কেলেঙ্কারি। কেন্দ্রের মনমোহন সিং সরকারের এবারের দুর্নীতি দেশের কয়লা খনির বরাত নিয়ে। এটি ইতিপূর্বের সব দুর্নীতিকে ছাপিয়ে গেছে অর্থমূল্যে। ক্যাগের চূড়ান্ত হিসেবে শুধু বেসরকারি কোম্পানিগুলি বিনা টেন্ডারে বা বিনা নিলামে বরাত পাওয়ায় দেশের রাজকোষের ক্ষতি হয়েছে ১.৮০ লক্ষ কোটি টাকা। ছাপিয়ে গেল দেশের এযাবৎ সর্বোচ্চ দুর্নীতি টু-জি কেলেঙ্কারিকেও। সেটা ছিল ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি।

কী বলা হবে একে? শুধুই পাইয়ে দেওয়া— স্বজন-পোষণ? নাকি উদারনীতিতে দেশের সম্পদের যথেচ্ছ লুণ্ঠন? সরকারি মদতে দেশের সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে বেসরকারি পুঁজির হাতে। দুষ্টচক্রের পুঁজিবাদই এখন মনমোহন সিংয়ের সরকার পরিচালনার ইউএসপি। অতএব কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে লগ্নির নামে জলের দরে দিয়ে দেওয়া হলো দেশের অমূল্য সম্পদ। সেই দেওয়া হতে পারে লিজের বিনিময়ে, কিংবা সংস্থার শেয়ার বেচে কিংবা পিপিপি কিংবা আরও নতুন কোনও উদ্ভাবনী কৌশলে। যেভাবেই হোক, আমজনতা ও দেশের স্বার্থ যতই জলাঞ্জলি যাক, তাতে ক্ষতি নেই, শুধু জিডিপি বাড়ছে কিনা  দেখতে হবে। আর তার জন্যে চাই বেসরকারি লগ্নি। তাতে যদি কর্পোরেট লুঠকেও মদত দিতে হয় হোক, ক্ষতি নেই। মনমোহন সিং সরকারের এই দর্শন অনুসারেই বিনা টেন্ডারে ও বিনা নিলামে জলের দরে দেশের ১৫৫টি কয়লা খনি অঞ্চলের (‘কোল ব্লক’) একটি বড় অংশই তুলে দেওয়া হয় শতাধিক বেসরকারি সংস্থার হাতে। এতে যা কয়লা আছে তার ৯০% সঞ্চয়কে বর্তমান বাজার দরে ধরে ক্যাগ হিসেব কযে দেখিয়েছে মোট ১.৮০ লক্ষ কোটি টাকার বেআইনি সুবিধা পেয়েছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। এই বেআইনি ডিলে বেসরকারি সংস্থার প্রাপ্তিযোগ ও সরকারি লোকসানের পরিমাণ এতটাই! তবু কয়লা-দুর্নীতির এ হলো একটি সামান্য অংশমাত্র। ডুবন্ত হিমশৈলের চূড়ার মতো। সরকারি আধা সরকারি বেসরকারি সব সংস্থাই এইভাবে বরাত পেয়েছিল ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে। কয়লা খনির যথেচ্ছ বণ্টনে ক্যাগের প্রাথমিক হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ ছিল অবিশ্বাস্য— ১০.৬৭ লক্ষ কোটি টাকা! প্রাথমিক এই হিসেব একটি বহুল-প্রচারিত ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ পড়ে যায়। এমন বিপুল অঙ্কের কেলেঙ্কারি চাপা দিতে নানাভাবে নানা যুক্তি ও কৌশলের অবতারণা শুরু হয়। প্রথমে বলা হয়, সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থাগুলিকে বাদ দিয়ে অনিয়মের হিসেব করা হোক। কী যুক্তি? নিয়ম কি সরকারের ক্ষেত্রে একরকম, আর বেসরকারি হলে অন্যরকম? আসলে বলতে চাওয়া হল অনিয়মের মাধ্যমে কয়লা বণ্টনে যে লাভটা বেসরকারি হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে কেবল সেটাই ধরা হোক। তখন নতুন করে এই হিসেব কষা হল। এরপর সরকারের পক্ষে উদারনীতির মহাপ্রচারক কিছু মিডিয়া এবং অর্থনীতিবিদ বলা শুরু করলেন যে বেসরকারি সংস্থার লাভ বলে এতটা বড় অঙ্ক যা দেখানো হচ্ছে তা আদতে আসবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া এই পরিমাণ কয়লা তো একদিনেই তোলা হবে না। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি এবং হয়ত ২৫ বছর ধরে খননের পর এই পরিমাণ কয়লা পাওয়া যাবে। তখন বাজার দর, এতদিন পরে কিছু মুনাফা পাওয়ার সম্ভবনা এসব কি এখন সরাসরি সরলীকরণে ক্যাগ যেভাবে দেখাচ্ছে সেটা গ্রহণযোগ্য? ক্যাগের হিসেবের পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হলো, শেষ পর্যন্ত ক্যাগকে বলতে হয় যে বহু উন্নত দেশের অডিটররা এদেশে এসে ক্যাগের কাছ থেকেই হিসেব পরীক্ষণ শিখে যান, কারণ ক্যাগের পদ্ধতি ও কাজ আন্তর্জাতিক গুণমানের।

এইভাবে রুখে দাঁড়ানোর পর ক্যাগ চূড়ান্ত রিপোর্টে কেবলমাত্র বেসরকারি সংস্থাগুলিকে নীতিবহির্ভূত ভাবে পাইয়ে দেওয়ার পরিমাণটুকুই জানায়। তাও এই হিসেব করা হয়েছে কেবলমাত্র সব থেকে কম গুণমানের কয়লার বর্তমান বাজার দরে, কিন্তু বিস্তারিত সেই রিপোর্ট আজ পর্যন্ত সামনে আনা হলো না। জানা গেছে, বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়ার দু সপ্তাহ আগেই ক্যাগ কেন্দ্রের কাছে জমা দিয়েছে বিস্তারিত রিপোর্ট। কিন্তু দেশজুড়ে হৈ চৈ এর আশঙ্কায় কেন্দ্র তাকে বাজেট অধিবেশনে পেশ করে নি। মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিস্তারিত রিপোর্টে যাই-ই জানা থাক, এটা আরও একবার প্রমাণিত হল : উদারনীতিতে দেশ শাসনের নামে মনমোহন সিং সরকার দেশকেই দেউলিয়া করে দিচ্ছে। কয়লা কেলেঙ্কারি তারই নতুনতম প্রমাণ।

# শহর জুড়ে ত্রিশূল আলো

মালবিকা সাহা

কলকাতা শহর জুড়ে এখন সুন্দরের আবাহন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে রবীন্দ্রসংগীত, রক্তাক্ত সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের বিপরীতে স্নিগ্ধ নীলাভ রং-এর বাহার। এর মধ্যে নজরুলের জন্মদিনে শহর জুড়ে গান— 'তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়...'।

পাঁচ বছরের কাজ 'দশ মাসে সম্পন্ন' করার পর শহরে সুন্দরের সমারোহ। বছর কুড়ি আগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত কর সেবকদের হাতের ত্রিশূল, গোধরা কাণ্ড ঘুরে কলকাতার রাস্তায় নবরূপে আবির্ভূত হয়েছে। ত্রিশূলের নয়া অবতার রূপে অভ্যুদয়ের অবয়বটি চলতি ভাষায় 'ত্রিফলা' আলো— কেএমডিএ-র দরপত্র আহ্বানের দলিলে যাকে 'ট্রাইডেন্ট লাইট' বলে অভিহিত করা হয়েছে। নামটা শুনে যদি স্মৃতিপটে কোনও ভয়ঙ্কর অনুষঙ্গ উপস্থিত না হয় তবে মনে করিয়ে দেওয়া যাক যে বাবা বুশ যখন প্রথমবার ইরাক আক্রমণ করেছিলেন, তখন ইরাকের বাচ্চাদের বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের ওপর যে ক্ষেপণাস্ত্রটির পরীক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন তার পোষাকি নাম ছিল 'ট্রাইডেন্ট মিশাইল'। ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সাধারণ মানুষ তাদের দেশ থেকে এই ট্রাইডেন্ট ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি উচ্ছেদের জন্য গত কয়েক দশক ধরে আন্দোলন করে অনেকটা সাফল্য পেয়েছেন।

নামের অনুষঙ্গ-এর কথা থাক। যদিও অনেক পণ্ডিত মানুষ বলে গেছেন নামে কি বা আসে যায়! তবুও নাম অনেক ক্ষেত্রে অশুভ সংকেতবাহী হয়ে উঠতে পারে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর যাবতীয় জ্বলন্ত এবং উদ্যত সমস্যার 'সমাধান'-এর পর মাটির মানুষদের বিনোদনের স্বাদ দেওয়ার সাধু উদ্দেশ্যে দিদি-র সরকার এই অগ্নিক্ষরা নির্দয় নিদাঘকালে ত্রিশূল-এর আদলে একসঙ্গে তিনটি করে আলো ত্রিফলা হোল্ডার-এ লাগানোর বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। প্রথমে কলকাতা শহর এবং ক্রমে ক্রমে বামফ্রন্ট-এর তৈরি গ্রাম-শহর বিভাজন ঘোচানোর অনন্য সংকল্পে অন্যান্য জেলা শহরে এই ত্রিশূল আলো ছড়িয়ে পড়বে। এই ত্রিশূল আলো বসানোর উদগ্র তাগিদে কলকাতা পৌরসংস্থা শহরটিকে ১০টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত শহরের ঐ বিভাজিত দশটি অঞ্চল জুড়ে সর্বমোট ৬৫০০টি এই ত্রিশূল আলো বসেছে। বর্তমান প্রতিবেদক মার্চ ২০-২৭, ২০১২ কলকাতার ১৪১টি পুর ওয়ার্ডের মূল রাস্তাগুলোতে এই ত্রিশূল আলো কোথায় কোথায় বসেছে তার একটি সরেজমিনে মাঠস্তরের সমীক্ষা চালান। হিসেব কষে দেখা গেল ৬৫ শতাংশ আলো বসেছে প্রায় সরাসরি গাছের পাশে। ফলে ত্রিশূল আলোর কোথাও দুটো, কোথাও কোথাও তিনটেই গাছের পাতার আড়ালে ডুব মেরেছে। সৌন্দর্যের দফারফা— সঙ্গে সঙ্গে গাছেরও। এইবার আসা যাক 'সৌন্দর্য'র দ্বিতীয় বিষয়টিতে। শ্যামবাজার থেকে মৌলালি, শোভাবাজার থেকে খান্না, বালিগঞ্জ থেকে চেতলা, আনন্দপালিত থেকে গোলপার্ক— শুধু এই সামান্য অংশটুকুতেই সমীক্ষা করে দেখা গেল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত এই ত্রিশূল আলোগুলোর ৩০ শতাংশ জ্বলে না। (বাল্ব-এ গোলমাল আছে— 'টেন্ডার করে কেনা'-র ফল!)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুটো আলোও জ্বলে না।

যারা 'পরিবর্তন'-কে আরও সময় দেওয়ার কথা বলেন, তাঁরা বলেন প্রাক্তন বামফ্রন্ট-এর সমর্থকবৃন্দ যে কোনও ছল-ছুতোতে শিশু সরকারকে বিব্রত করতে বদ্ধপরিকর। শহর সাজানোর মতো এমন এক নিরামিশ কর্মকাণ্ডেও নিন্দুকেরা সরকার বিরোধিতার জিগির তুলছেন। যাকগে, সেসব কথা থাক। বরং টাটকা দুটো-চারটে খবর দেওয়া যাক।

এই ত্রিফলা আলোগুলো এক একেকটি বসাতে (পৌর সংস্থার টেন্ডার দলিলে যা দেখা যাচ্ছে) খরচ পড়েছে ১৮ হাজার টাকা। ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত পুর সংস্থার হিসেব মতে ৬,৪০০টি এমন ত্রিফলা আলো বসেছে। আলো বসার বর্তমান হার বজায় থাকলে এতদিনে সংখ্যাটা ৮ হাজার ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। এখনই বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা পুরসভার কোষাগার থেকে নানান ফড়ের হাত ঘুরে কোথায় পৌঁছেছে তা জানার জন্য কিরীটি রায় বা শার্লক হোমস্‌কে তলব করা ছাড়া গতি নেই। একেকটি ত্রিফলা আলো ৫৪ ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন। এমন ত্রিফলা আলো বুভুক্ষুর মতো বিদ্যুৎ শক্তি শুষে নেয়। পৌরসভার জনৈক মুখপাত্র রাস্তার আলো এবং বিদ্যুৎ বিষয়ক মেয়র-ইন-কাউন্সিল-এর সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন যে, এই ত্রিফলা আলোর বিদ্যুৎ বিল মেটাতেই কলকাতা পৌরসভা দেউলিয়া হয়ে যাবে। এই আলো বসানো এবং চালু হওয়ার আগে ডিসেম্বর ২০১১-র কলকাতা পৌরসভার রাস্তার আলোর জন্য বিদ্যুতের বিল আসতো প্রায় ১৫ কোটি টাকার মতো। জানুয়ারি ২০১২-তে ত্রিফলা আলোর মাধ্যমে এই সৌন্দর্যায়ন-এর ধাক্কায় পুরসভার রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করার জন্য বিল লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ২১ কোটি টাকা। পুরসভায় টাকার ঘাটতির কারণে এপ্রিল ২০১১ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত পুরসভা রাস্তার আলোর

জন্য বিদ্যুতের বিল যথাসময়ে মেটাতে পারেনি। এই বিষয় নিয়ে যে কেবল বিরোধী দলের চিফ-হুইপ শ্রী অমল মিত্র-ই সরব হয়েছেন এমন নয়, কয়েকজন কংগ্রেস কাউন্সিলারও এমন অপচয়ের দিকে আঙুল তুলেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পুর উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি বিধাননগরের উন্নয়ন ভবনে আধিকারিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় জানিয়েছেন যে হাওড়া, চন্দননগর, কল্যাণী এবং চুঁচুড়া-তে কলকাতার আদলে এই ত্রিফলা আলো বসবে। এরপর আসানসোল, দুর্গাপুর বর্ধমান, বহরমপুর, ফরাক্কা, মালদহ এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে এমন সৌন্দর্যায়ন চলবে। প্রথম দফায় ত্রিফলা আলোর জন্য যে টেন্ডার করা হয়, তাতে 'নিন্দুক' এবং 'চক্রান্তকারী'দের মতে স্বচ্ছতা ছিল না। তৃণমূলের একাধিক বিশেষ নেতা দরপত্র দেওয়া সংস্থাগুলির মালিক বা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে 'আলোচনা' করেন। বিশেষত, 'ক্রম্পটন-গ্রীভস' সংস্থা তো প্রায় প্রকাশ্যেই স্বচ্ছতার অভাবের প্রশ্ন তোলের এবং শোনা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত সংস্থা এবং 'মধ্যস্থতাকারীরা' সমঝোতায় পৌঁছাতে পেরেছে!

এই দরাদরি এবং 'আলোচনা'-র বিষয়টি নিয়ে শাসকদলের অন্দরমহলের কোন্দল এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় যে 'পরিবেশ এবং অন্যান্য যুক্তি' দেখিয়ে শিলিগুড়ি পুরসংস্থা আপাতত ত্রিফলা আলো না বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা থেকে দূর-নিয়ন্ত্রণের প্রমাণিত পদ্ধতিটি এক্ষেত্রে অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। গোয়েঙ্কাদের কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের কাছে এই সেদিন পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই কোটি টাকা। এই ত্রিফলা আলোর জন্য পুরসভার বাড়তি বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে বছরে প্রায় ৯০ কোটি টাকা।

ভারত সরকারের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে যে, (২০১১-র জনগণনা মোতাবেক) পশ্চিমবাংলার (সারা ভারতেও প্রায় একই চিত্র) ৬০ শতাংশ গ্রামীণ পরিবার বিদ্যুৎ পরিষেবা পায়না। শহরের ১৫ শতাংশ গৃহস্থবাড়িতে বিজলি নেই, তারা কেরোসিনের কুপি জ্বালায়। তিনটি ত্রিফলা আলো একেকটি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি গিলে খায়। কলকাতাকে লন্ডন বানানোর দুর্মর প্রচেষ্টায় এই সৌন্দর্যায়নের ধাক্কায় গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের ৩২ হাজার পরিবার বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

যে আলোগুলো এখনই বসে গেছে, সেগুলো একেবারেই অকেজো। আলোগুলো আকাশমুখী, ফলে সস্তা কাঁচের ঢাকনা ভেদ করে বর্ষার জল ঢুকে প্রায় অবধারিতভাবেই বাল্বগুলোকে কেটে দেবে। আলোগুলোর রাস্তা আলোকিত করার ক্ষমতাও অতি সামান্য। এদেরকে তাই বসানো হয়েছে হলুদ রং-এর তীব্র ক্ষমতাসম্পন্ন সোডিয়াম আলোগুলোর তলায়। তাতে সৌন্দর্যও মার খাচ্ছে, অথচ খরচ হয়ে চলেছে।

সর্ব বিষয়ে পূর্ববর্তী সরকারের 'বিপরীত রাস্তায়' (তাই কি? নাকি একই রাস্তার উল্টো ফুটপাত দিয়ে পূর্ববর্তী সরকারের নির্দেশিত পথ-নির্দেশ মেনে হাঁটা?) হাঁটার রাজনৈতিক তাগিদে বর্তমান সরকারও পরিবেশের ক্ষতিকে বিশেষ আমল দেন না। অবশ্য ধর্ষণের ঘটনাকে সাজানো বললে কয়েকটা পাখি, কয়েকটা গাছ বা প্রজাতির অদৃশ্য হয়ে যাওয়াকে নিতান্তই এক গুরুত্বহীন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার রাস্তা তো খোলা!

ভারতের বিমানবন্দরগুলোতে পাখির ধাক্কায় বিমান চলাচলে বাধা, এমনকি পাখির সঙ্গে বিমানের ধাক্কায় ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটা প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনা। বিমান চলাচলের রাস্তায় তীব্র আলোতে পথভ্রষ্ট হয়ে বাসায়-ফেরা পাখির ডানার শব্দ স্তব্ধ হয়ে যায় প্রায়ই। কলকাতার রাস্তায় এই ত্রিফলা আলোগুলি পরিযায়ী পাখিদের চিরাচরিত রাস্তা ভুলিয়ে তাদের এই আলোর দিকে আকর্ষিত করবে এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এদের অনেকেই প্রাণত্যাগ করবে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডে রাজা বাজারের আশপাশে এমন মৃত পাখি প্রায় প্রতিদিন সকালে পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্বল্প দৈর্ঘ্যের স্তম্ভের ওপর এই ত্রিফলা আলোগুলো অবস্থান করে বলে পতঙ্গরা ঝাঁকে ঝাঁকে এই আলোর দিকে আকর্ষিত হয় এবং তীব্র আলোর প্রভাবে এদের জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে। এই পতঙ্গের খাদক পাখিরাও তাই খাদ্যের অভাবে হয় শহর থেকে অন্যত্র পাড়ি জমায়, অথবা স্রেফ মরে যায়। অনেক পরিবেশকর্মী এমন অনেক ঘটনা সমীক্ষা করে বার করেছেন।

পরিবেশের ক্ষতির অন্য দিকটি নিয়ে 'সৌন্দর্যপন্থী' বিধায়কবৃন্দ বিলকুল মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এখনই কলকাতা শহর সব মিলিয়ে ৯৩ লক্ষ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গাস বাতাসে ছাড়ে। ভূ-উষ্ণায়নের জন্য এই গ্যাসটির ক্ষতিকর দিক বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। পশ্চিমবাংলায় যত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন হয় তার ৯৭ শতাংশ আসে কয়লা পুড়িয়ে উৎপন্ন তাপ-বিদ্যুৎ থেকে। হিসেব বলছে প্রতি মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বাতাসে ১১২৪ কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়তে হয়। এই ত্রিফলা আলোগুলো রাক্ষুসে খিদে নিয়ে বিদ্যুৎশক্তি গিলে খায়। তাদের খিদে মেটাতে যে বাড়তি তাপ-বিদ্যুৎ লাগবে তার জন্য বাড়তি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ দাঁড়াবে বছরে প্রায় ৪৪ হাজার টন। এই পরিমাণ বাড়তি কার্বন-ডাই-অক্সাইড

শুষে নেওয়ার জন্য গাছ লাগাতে হবে, তাই প্রয়োজন বিপুল পরিমাণে সামাজিক বনসৃজন। গুনে গুনে বছরে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার নতুন গাছ লাগিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারলে তবে এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতিকর গ্যাসের প্রভাব কমানো যাবে। মনে রাখতে হবে এই শহরে বছরভোর খুব জোর ১০,০০০টি গাছ লাগনো হয় আর তাদের মাত্র ৩০ শতাংশ বেঁচে-বর্তে থাকে।

পরিবেশ রক্ষা বা গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার মতো এমন সব ব্যাপার নয়, স্রেফ অর্থনৈতিক কারণেই পুরসভার মুরুব্বিবৃন্দ (টেন্ডার মতে কাজটির বরাত দেওয়ার পরপরই) বলতে শুরু করেছেন যে তাঁদের অগ্রাধিকার হলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়। মেয়র-ইন-কাউন্সিল-এর একজন প্রভাবশালী সমস্য, জনাব মনজার ইখ্‌বাল পুরসভার বাজেট বিতর্কের সময় এই মর্মে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেও ছাড়েননি।

এর ফলে আবার এক বিরাট দরপত্র হাঁকার রাস্তা পরিস্কার হলো। সম্প্রতি কোলকাতা পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে বিদ্যুৎ শক্তি সাশ্রয়ের জন্য এই ত্রিফলা আলোগুলোকে রাত ১১টার পর আপনা থেকেই নিভিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয় সুইচ বসবে। প্রথম দফায় বসবে ৪৫০০টি সুইচ। এই মর্মে দরপত্র আহ্বানের পক্রিয়া সম্পন্ন দরপত্র দেওয়া সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাছাই তৃণমূল নেতাদের 'আলোচনা' চলছে। সুইচগুলোর পরমায়ু, আলোর পরমায়ুর মাত্র ৪০ শতাংশ। অতএব আবার টেন্ডার, কাটমানি...। 'পরিবর্তন' দীর্ঘজীবী হোক!

---

# 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রশক্তি এবং সোনু সোরি-কমলেশ মাহাতদের কাহিনী

**পর্যবেক্ষক**

পৃথিবীর বৃহত্তম 'গণতান্ত্রিক' দেশ ভারত, আর সেই 'গণতন্ত্র'-এর মূল উৎস নির্বাচন-ভিত্তিক সংসদীয় ব্যবস্থা। এবছর সেই সংসদ ষাট বছরে পা দিলো বলে বিরাট উৎসব ও মহা ধুমধাম চলছে। সেই ধুমধামের সাথে এ দেশেরই অন্তত দু'জন মানুষের সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখুন তো আপনারা পাচ্ছেন কিনা!

q তাদের একজনের নাম সোনু সোরি। তার বাবা ছত্তিশগড়ের বাড়ে-বেরমা গ্রামের নির্বাচিত সরপঞ্চ ছিলেন বলে মাওবাদীরা গত বছর জুন মাসে তার বাড়ি আক্রমণ করে। অথচ তার দু'মাস পরে তিন সন্তানের জননী স্কুলশিক্ষিকা সোনুকেই পুলিশ 'মাওবাদী' বলে অভিহিত করে গ্রেপ্তার করার মতলব করে। সে তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দিল্লীতে পালায়। সেখানে সে গ্রেপ্তার হয়, এবং তার উপর পুলিশ বীভৎস অত্যাচার করে। প্রথমে '*আউটলুক*' পত্রিকায় এবং পরে এই পত্রিকারই নভেম্বর, ২০১১ সংখ্যায় তার করুণ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো অপরাধের বা আইন ভাঙার তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই পুলিশ তার উপর অত্যাচার চালিয়েই যায়। সম্প্রতি চিকিৎসার জন্য দিল্লীর এআইআইএমএস প্রথমে তাকে ভর্তি করতেই অস্বীকার করে, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শেষে ভর্তি করতে বাধ্য হয়। পুলিশের অমানবিক অত্যাচারের ফলে তার যৌনাঙ্গে প্রচণ্ড জ্বালা হতে থাকে। তার উকিল কলিন গঞ্জালেস হাসপাতালে তার সাথে দেখা করার পর জানিয়েছেন, পুলিশ অত্যাচারের পদ্ধতি হিসাবে তার যৌনাঙ্গে পাথর ও কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, ফলে মাসের পর মাস ধরে সেখান থেকে রক্ত বেরোচ্ছে এবং জ্বালা করছে। ডাক্তারদের প্রাথমিক সন্দেহ, সেখানে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটেছে। সে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ছত্তিশগড় পুলিশ তাকে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশন-মতো ন্যূনতম ওষুধও দেয় নি, চিকিৎসা করতে হাসপাতালেও নিয়ে গেছে অনেক দেরি করে। সোনিদের পরিবারের সঙ্গে গান্ধীবাদী প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব হিমাংশু কুমারের পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল, তাঁকে লেখা সোনির সোরির চিঠি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল।

q কমলেশ মাহাতোর (বয়স ২৩ বছর) বাড়ি এই রাজ্যেরই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার লালগড় থানার গোপীনাথপুর গ্রামে। ইতিহাসে অনার্স কমলেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলনে বিশেষ সক্রিয় ছিল। ঝাড়খন্ড স্টুডেন্ট ফেডারেশনের (জেএসএফ) সম্পাদক হিসেবে স্থানীয় কলেজগুলির নির্বাচনে সক্রিয়তার কারণে সে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বিরাগভাজন হয়ে পড়ে। তারা তাকে হুমকি দেয়, গত বছরে কয়েকবার আক্রমণেরও চেষ্টা করে। তৃণমূল-পুলিশ যৌথ উদ্যোগে গঠিত 'ভৈরব বাহিনী'র সশস্ত্র মাস্তানরা তার বাড়িতেও আক্রমণ ও লুটপাট চালায়। অবশেষে গত ২৭ এপ্রিল পুলিশ তাকে দহিজুরি গ্রাম থেকে ট্রেকারে চড়ে বাড়ি ফেরার সময় আটক করে, এবং থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। অথচ পরের দিন তাকে 'বন্দুক-সহ ধরা হয়েছে' বলে ঝাড়গ্রাম কোর্টে পেশ করা হয়। ৫ ফুটেরও কম দীর্ঘ কমলেশের ৪ ফুট লম্বা বন্দুক হাতে ঘোরাফেরা করার, এবং তা শুধু পুলিশেরই চোখে পড়ার গল্পটি কোর্টে কৌতুকের খোরাক জোগায়। পুলিশি হেফাজতে রাখার পুলিশি দাবি

প্রত্যাখ্যান করে বিচারক তাকে জেলে পাঠান। জেলের মধ্যেও তাকে ভয় দেখানো হয় এবং আবার পুলিশি হেফাজতে নিয়ে অত্যাচারের হুমকি দেওয়া হয়। ভীত-সন্ত্রস্ত কমলেশ ৮ মে জেলের ভিতরে ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। হাসপাতালে পাঠানো হলেও, পুলিশ তাকে হাতকড়ি দিয়ে বেডের সাথে আটকে রাখে। খবর পেয়ে এপিডিআর-এর একটি তদন্ত টিম ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে তার সাথে দেখা করতে গেলে পুলিশ অন্যায় ও অবৈধভাবে তাদের ৬ ঘন্টা আটকে রাখে। কমলেশের সমগ্র ঘটনাটি বিবৃত করে এপিডিআর রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ পেশ করেছে। এদিকে কমলেশের উকিল গত ১৩ মে ঝাড়গ্রাম এসিজেএম আদালতে পুলিশ কর্তৃক 'মিথ্যে মামলা'-র অভিযোগ তোলেন, এবং তার ভিত্তিতে বিচারক কমলেশকে জামিন দেন। জেলা আদালতে পুলিশ তার বিরুদ্ধে আপিল করলেও এসিজেএম-এর রায়ই বহাল থাকে।

কী মনে হচ্ছে? সোনু আর কমলেশরা এবং তাদের মতো সারা দেশের লক্ষ লক্ষ নিম্নবর্গের নিঃস্ব লোকেরাও পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের স্বাদ পাচ্ছেন?

## সমাজকর্মী হিমাংশু কুমারকে লিখিত সোনি সোরির চিঠি

পূজনীয় পিতা, গুরুদেব,

প্রণাম।

আপনারা সব কেমন আছেন? কেমন আছেন দিদি'জি? হরিপ্রিয়াকে খুব মনে পড়ে। ওর দুষ্টুমি নিশ্চয়ই আগের মতোই আছে। একবার আমাকে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। গুরুজি, সমাজকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু বলি, শুনি, আমি বলি এঁরা ভালো মন্দ যাই করুন, পীড়িত মানুষদের ভালোর জন্যই করবেন। আমি নিজের জন্মভূমির জন্য সর্বস্ব হারিয়েছি। আপনার দেওয়া শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই আমার নেই। আপনি বলেছিলেন, 'বেটি, সত্যকে কেউ পরাজিত করতে পারে না।' ঐ বিশ্বাসটুকু নিয়েই বেঁচে আছি। আমার যদি মৃত্যুও হয়, সত্যের জন্য যে লড়াই আমি করেছি, সেই যুদ্ধকে পরাজিত হতে দেবনে না। বাবা, এ কীরকম আইন! এই আইন বানিয়েছেন যাঁরা, পুলিশ অফিসার, কর্মীরা অনেক অত্যাচারের পর, নোংরা গালাগালি দেওয়ার পর, জখমি করার পর আমাদের আদালতে পেশ করল, অথচ আদালত ঐ অত্যাচার, নির্যাতনের বিচার না করেই, জেলে পাঠিয়ে দিলেন? আমার দোষ কী? এমন কোন্ অপরাধে আমি অপরাধী যে আমার জীবনকে বলি দিতে হলো? আপনি জানেন না, আপনার শিষ্যার সঙ্গে কী কী আচরণ করা হয়েছে, কত লজ্জাজনক ব্যবহার সইতে হয়েছে। আদালতে যেসব প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল তাতেই স্পষ্ট ছিল, নির্দয়তা কোনখানে পৌঁছেছিল। দিল্লী থেকে কেন যে এসেছিলাম, আপনি কেন আমাকে বাধা দেন নি। দিল্লীর আদালতে চীৎকার করেছি, কেঁদেছি। হাহাকার করেছি, তবু আমার ভিতরকার ব্যথাকে কেই বোঝেন নি। আমাকে যখন নিয়ে আসা হচ্ছিল, আমি অনুভব করছিলাম যে আমাকে মেরে ফেলা হবে কিংবা আমার ভিতরকার শক্তিকে পঙ্গু করে দেওয়া হবে, তাই হয়েছে। আজ আপনার শিষ্যা জীবন্ত শব হয়ে বেঁচে আছে। এখনও ঐ গুন্ডাগুলোর সঙ্গে থেকেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আর কতদিন এদের সঙ্গে লড়াই করব, আপনি ভালো করে জানেন এখানকার অত্যাচারের স্বরূপ। নির্যাতনের বিরদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা আমার আর যেন নেই। আমি মানছি যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই আমার চিকিৎসা শুরু হয়েছিল, তাই প্রাণে বেঁচেছি। আপনারা আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন, তবুও আমি একটুও সুরক্ষিত নই, আমি তা অনুভবও করি না। আপনারা আমার কথা বোঝার চেষ্টা করবেন। এক তো চরম মানসিক কষ্টের ভার বয়ে চলেছি, অন্যদিকে এখানকার লড়াইয়ের ধারাও পীড়া দিচ্ছে। যে পুলিশ আদালতের নির্দেশকে মান্যও করেনি, ভয়ও পায়নি, তাদের ওপর কী করে বিশ্বাস রাখব? সাকেত আদালতে আমার বোন হিসেবে যাবে, কিন্তু ওর কোনও ক্ষতি হবে না— এই কথা দিয়েছিল পুলিশ অফিসার, কিন্তু কথা রাখেনি। আদালতের চোখে ওরা দাগী অপরাধী? এর কোনও শাস্তি নেই, কিন্তু কেন নেই? গুরুজি, আমি একেবারেই ভালো নেই। কলকাতার ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যতদিন না ব্যথা কমে, ততদিন ওষুধ খেয়ে যেতে, এক মাসের ওষুধ দিয়েছিলেন, তা শেষ হয়ে গেছে। একবার জানিয়েছিলাম সে কথা, কিন্তু ওষুধ পাইনি, এখন আর বলা উচিত নয় বলে মনে করছি। ধীরে ধীরে ব্যথা আরও বাড়ছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এদের দেওয়া আঘাতের নিরাময়ের জন্য এদেরই সাহায্য চাইব? এর মানে তো এদের সামনে নত হয়ে যাওয়া। ওরা বাধ্য করছে আমাকে এইসব

ভাবতে। ছত্তিশগড়ের পুলিশ আমাকে পীড়নের কোনো পথই বাকি রাখেনি। যখন চিকিৎসার জন্য কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন অসংখ্য বডিগার্ড ছিল, তবু কলকাতার চিকিৎসক দল যত ভালোবেসে আমাকে দেখেছেন, আপন মনে হয়েছিল তাঁদের। ছত্তিশগড়ের পুলিশের জন্য এমন কোনও আইন নেই, যা এদের মনুষ্যত্ব জাগ্রত করে। ভবিষ্যতে আমার কিছু হলে, দায়ী থাকবে ছত্তিশগড়ের ও প্রশাসন ও পুলিশ। কারণ পুলিশের অত্যাচারে ভিতর থেকে ভেঙ্গে গেছি। আমি সুরক্ষিতও নই। আমার তিনটে বাচ্চাও খুব কষ্টে আছে। আমার কিছু হলে, কে ওদের সহায় হবে? আপনাদেরই করতে হবে। এখন আমার চেয়েও বেশি ওরা লিংগা'কে অত্যাচার করছে। খিদের যন্ত্রণা দেওয়া, কুৎসিত গালি দেওয়া, অত্যাচারের কত না রকম। এসপি অঙ্কিত গর্গ তো এও বলেছিল, ‘‘লিংগারামের মৃত্যু খুব জরুরি। মেরে ফেলতে পারিনি, কিন্তু জেলে মরবেই, সে ব্যবস্থা করে ফেলেছি। নিজেকে কি ও বিধ্বংসী কামান বলে ভাবে? চারটে গ্রামের সিডি, ক্যাসেট বানিয়ে কোন প্রমাণ তৈরি করছে? পুলিশের পেছনে লাগা? এবার বুঝিয়ে দেব সব। দেখে নেব স্বামী অগ্নিবেশ কী করে বাঁচে? ও তো একটা কট্টর নকশালবাদী, তাই নকশালীদের সাহায্য করে।’’ শুনছি, লিংগা বলছিল দেড় বছর আগে থানায় রেখে যে অত্যাচার করেছিল, এখানেও সেই একইরকম করছে। সবসময় বলছে, ‘‘তোকে তো মরতেই হবে।’ এর মানে আমাকে এরা মেরে ফেলবে, তারপর কোন না কোন কারণ দেখাবে। আদালতও এদের বিশ্বাস করবে। আধপেটা খেতে দেওয়া, কাগজ পড়তে না দেওয়া, টিভি-তে খবর শুনতে না দেওয়া- এসব কী? কতদিন সহ্য করব এসব? কী দোষ আমার? বিনা কারণে আমাকে জেলে পাঠানো হলো। মাঝে মাঝে ভাবি ধর্নায় বসে যাই। গুরুজি, লিংগাকে বাঁচান। লিংগার কিছু হয়ে গেলে পুলিশ প্রশাসন জিতে যাবে। আমি জানি, কারণ থানায় রেখে আমার সামনে কত কথা বলা হয়েছে, সব কথা আপনাকে জানাতে চাই, সুপ্রিম কোর্টকেও। দিল্লীতে গ্রেপ্তার না হলে এরা লিংগা আর আমাকে মেরে ফেলত, ভাগ্য ভালো যে ওখানেই গ্রেপ্তার হয়েছিলাম। খুব কষ্ট করে লিখছি, ইলেকট্রিক শক খেয়ে খেয়ে আমার হাত কাঁপে, দেখতেও অসুবিধা হয়। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি। রক্তের মাত্রা ১০ গ্রাম ছিল, অত্যাচারে কমে ৭-৮-এ নেমে এসেছে। রায়পুরে আসার পর রক্তমাত্রা বাড়ানোর জন্য ট্যাবলেট দিচ্ছে। গুরুজি, অঙ্কিত গর্গ আমার এসার নোট কাণ্ডে আমাদের ঘুঁটি বানাতে চেয়েছিল, পারেনি, আপনার দেওয়া সত্যের শিক্ষার শক্তি আমার আছে। দুঃখ এই যে এরা আমার শরীরকে ঘায়েল করতে পেরেছে। বেঁচে থাকলে ছত্তিশগড় সরকার আর এসার কোম্পানির কাছে আমার প্রতি অত্যাচারের জবাব চাইব। একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ছিল, আছেও। অঙ্কিত গর্গ এও বলেছিল, ‘ওই প্ল্যান আমি বানিয়েছিলাম, তুই, লিংগা আর কিছু লোক ফেঁসে গেছিস, এবার প্ল্যানটা সফল হবে।’ গুরুজি, আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আপনি এবার আমাকে এসার কোম্পানির মালিকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন, আমার কিছু প্রশ্নের জবাব চাই। এসার নোট কাণ্ডের মামলা আমার জীবনের সম্মানকেই সংকটে ফেলেছে। যা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। গুরুজি, অপরাধী হলে এখানে থাকতে কোনো কষ্ট নেই। আমি নির্দোষ, তবু কেন আমাকে এখানে রাখা হয়েছে? কিছু তো বলুন, আমাকে অত্যাচারও করেছে। অত্যাচারীরা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন দান্তেওয়াড়ায় আদালতে যাই মনে হয় ওদের বন্দুক ছিনিয়ে মেরে ফেলি ওদের। আবার নিজেই নিজেকে বলি, আমি এরকম করব না। আমার অন্তিম বিশ্বাস, সুপ্রিম কোর্ট-ন্যায়ালয় আছে, যা করবার আদালত করবে। আমার শিক্ষা এই যে কলমের শক্তি দিয়ে লড়তে হবে। গুরুজি, আমি কত ভাগ্যবতী। আমার গর্ব হয় যে পদে পদে আমি আমার গুরুর সহায়তা পেয়েছি। গুরুজি, ২৬ শে জানুয়ারি আমার কর্মস্থল আশ্রমে তেরঙ্গা ঝান্ডা ওড়াবেন, এখানে অনুরোধ করে লাভ নেই। থানায় এই পতাকাকে ভীষণ বড় ঠাট্টা করা হয়েছে। এই গুণ্ডার দল এই ঝান্ডার মূল্য কী বুঝবে? আপনি সবসময় আমার ভালো কাজের সহায়তা করেছেন, এবারও করবেন আশা করি। যদি আশ্রমে তেরঙ্গা ঝান্ডা ছাড়া অন্য কোন পতাকা ওড়ানো হয়, তবে আমি চিৎকার করে ইচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চাইব, সুপ্রিম কোর্টের কাছে, রাষ্ট্রপতির কাছে। এই ভীরু, কাপুরুষ দেশবাসীর সঙ্গে বেঁচে কী লাভ? গুরুজি আপনার কথা খুব মনে পড়ে। আপনাকে স্মরণ করি আর ভাবি, কবে যে আবার গুরুর সঙ্গে দেখা হবে।

আপনার শিষ্যা,

৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

শ্রীমতি সোনি সোরী (সোড়ী)

Source : dantewarabani.blogspot.in

ঘটনাপ্রবাহ

# সাম্রাজ্যবাদের কুমীর কান্নার বিরুদ্ধে

**দীপ্তি চন্দ**

প্রতি বছরই বিশেষ বিশেষ দিনে (যেমন, 'স্মরণ দিবস'-এ) মার্কিন শাসকবর্গ বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত মার্কিন সৈন্যদের জন্য(যাদের অধিকাংশই হচ্ছে সমাজের নিচু তলার মানুষদের সন্তান-সন্ততিরা) বিশেষ শোক প্রকাশ করতে এবং দরদ দেখাতে কসুর করে না। সঙ্গে সঙ্গে তারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রতিনিয়ত প্রচার করে সারা পৃথিবীতে মানুষের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সযত্ন অভিভাবকত্বের তত্ত্বটিও, শৈশবের দোলনা থেকে শুরু করে কবরে যাওয়া পর্যন্ত যা প্রতিটি সাধারণ মার্কিন নাগরিকের মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

এবছর সেই বিশেষ দিনটিই (২৯ মে) আবার বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে গেছে দু'টি কারণে।

প্রথমত, তথাকথিত শান্তিবাদী (এমনকি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া!) প্রেসিডেন্ট ওবামা ওই 'স্মরণ দিবস'-এর ভাষণে নতুন করে জিইয়ে তুলেছেন বিগত শতকের ষাটের দশকে ভিয়েতনামে মার্কিনি হানাদারির 'মহত্ব'—কেননা সেই দিনটিই ছিল ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্য অনুপ্রবেশের ৫০তম বার্ষিকী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন : যদিও বহু লোক এখনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভিয়েতনামে মার্কিনি ভূমিকাকে 'অন্যায়' ও 'আগ্রাসনমূলক' বলে কুৎসা করে, মনে রাখবেন, আসলে আমেরিকা ভিয়েতনামে সৈন্য পাঠিয়েছিল এবং বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করে নিয়েছিল 'বিশ্বশান্তি'-রই লক্ষ্যে। উল্লেখ্য, ওই যুদ্ধে ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধাদের পরাক্রমে মার্কিনকে পরাজয় বরণ করে পিছু হটতে হয়েছিল এবং ৬০ হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছিল। নতুন করে এভাবে ভিয়েতনামের প্রসঙ্গ টেনে মার্কিন 'আত্মত্যাগ'-এর গপ্পো প্রচারকে 'নিন্দুকরা' কিন্তু ওবামাদের নতুন আগ্রাসনের (সিরিয়া? ইরান?) ভূমিকা বলে মনে করছেন।

দ্বিতীয় কারণটি আরও বেশি উল্লেখযোগ্য। সেদিনই প্রাক্তন মার্কিন সৈন্যদের 'ভেটারান্স ফর পিস' তাদের ওয়েবসাইটে আবেদন জানিয়েছিল : *যে সব মার্কিন সৈন্য বিদেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন শুধু তাদের জন্য নয়—যারা সেখানে মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা নিহত হয়েছেন, তাদের জন্যও শোকপ্রকাশ করুন। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, সেই যুদ্ধগুলিই ছিল অনর্থক, অন্যায় যুদ্ধ—আমেরিকার আগ্রাসী যুদ্ধের ফলেই প্রাণ দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে।এটা এমনই একটা নির্মম সত্য, যেটা কিছুতেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।*

শুধু তাই নয়, গত ২০ মে যখন চিকাগোতে মার্কিন-সহ ন্যাটোর বিভিন্ন দেশগুলি সিরিয়া বা ইরানে নতুন আগ্রাসন শুরু করার মৎলব ভাঁজছে, ঠিক তখনই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সেখানকার পথে নামেন বেশ কিছু প্রাক্তন সৈন্য, ইরাক বা আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য হিসেবে যারা মেডেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। একজন, ব্রক ম্যাকিন্টস, বলেন: *আমার মেডেলটি আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি ৩৩ হাজার শিশুর জন্য, আফগানিস্তানের যুদ্ধে যারা প্রাণ হারিয়েছে এবং যাদের জন্য কোনো স্মারকস্তম্ভ কোনো দিন নির্মিত হবে না।* আর একজন, নাম স্টিভ অ্যাকিসন, বলেন : *আমি আমার পাওয়া মেডেলগুলি ফেরৎ দিচ্ছি ইরাক ও আফগানিস্তানের শিশুদের জন্য —এই আশায় যে, এজন্য হয়তো কোনো দিন আমরা তাদের প্রতি যে অপরাধ করেছি, তারা তা ক্ষমা করে দিতে পারবে।*

ওবামা-সহ সারা পৃথিবীর যুদ্ধবাজদের কানে কি কথাগুলো পৌঁছোবে!

---

# জর্জ বুশ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা যুদ্ধাপরাধী— কুয়ালালামপুর ট্রাইবুনাল

**পরিচয় কানুনগো**

লণ্ডনের 'ওপিনিয়ন রিসার্চ বিজনেস' ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে, তাতে বলা হয়েছিল, আমেরিকার ইরাক যুদ্ধে দশ লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন। তিরিশ হাজারের বেশি মানুষকে বন্দী করা হয়েছিল। শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ এমন কী বিদেশীরাও বাদ যায়নি। আমেরিকার সামরিক কর্তারা পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, ৭০-৯০ শতাংশকে ভুলক্রমে ধরা হয়েছিল। কিন্তু আবু ঘাইব কারাগারে বন্দীদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার চলেছিল কিংবা গুয়ানতানামো বে-তে যে অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোও কী ভুল করে হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতগুলি অভিযান চালিয়েছে, হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ থেকে শুরু করে ভিয়েতনাম সহ সাম্প্রতিক ইরাক পর্যন্ত, সবগুলিই মার্কিনী রাষ্ট্রনায়কদের ঠাণ্ডা মাথার পরিকল্পনা। কোথাও ভুল ভাবার অবকাশ নেই।

সম্প্রতি, ২০১২ সালের ১১ মে 'কুয়ালালামপুর ওয়ার ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল' ইরাক যুদ্ধে বন্দীদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার, তাঁদের উপর অমানুষিক নির্যাতন এবং অকথ্য অত্যাচারের অভিযোগে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, তাঁর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড, তাঁদের পরামর্শদাতারা যথাক্রমে এলবার্ট, গঞ্জালেস, ডেভিড এ্যাডিংটন, উইলিয়াম হেইনস, সহকারী এ্যাটর্নি জেনারেল জে বাইবি এবং উপ সহকারী এ্যাটর্নি

জেনারেল জন চুন ইউ— এই আট জনকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে।

মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মহাথীর মহম্মদ ২০০৭ সালে 'কুয়ালালামপুর ফাউণ্ডেশন টু ক্রিমিনালাইজ ওয়ার' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফাউণ্ডেশন 'কুয়ালালামপুর যুদ্ধাপরাধ কমিশন' গঠন করে। আন্তর্জাতিক আদালতে উপেক্ষিত যুদ্ধাপরাধগুলিকে অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করাই কমিশনের কাজ। ইরাক যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন ইরাকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের চিফ ইঞ্জিনীয়ার আব্বাস আবিদ, ব্রিটেনের নাগরিক মোয়াজ্জাম বেগ এবং ইরাকি মহিলা জামিলা আব্বাস হামিদি। আফগানিস্থানের বারগাম, ইরাকের আবু ঘারিব, বাগদাদ বিমানবন্দরে এঁরা বিভিন্ন সময়ে বন্দী ছিলেন। মোয়াজ্জাম বেগ এবং রুহেল আমেদকে গুয়ান্তানামো বে-তে চালান করা হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় যে মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন, তার ভিত্তিতে এঁরা কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। এ ছাড়া ইরাকী নাগরিক আলি সাহাল এবং ব্রিটিশ নাগরিক রুহেল আহমেদ পৃথক বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিচারে সেই বিবৃতি দুটিও গৃহীত হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে পাঁচ সদস্যের একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। ট্রাইব্যুনালের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মালয় হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ৭৬ বছর বয়সী তান শ্রী দাতো লামিন বিন হাজি মঃ ইউনুস। ৭ থেকে ১১ মে ২০১২, একটানা পাঁচদিনের বিচার প্রক্রিয়ার শেষ দিন রায় ঘোষিত হয়। বলা বাহুল্য, অভিযুক্তদের কেউই বিচারসভায় উপস্থিত ছিলেন না। এ্যামিকাস কুরির মাধ্যমে তাদের বক্তব্য শোনা হয়।

আব্বাস আবিদকে আমেরিকান ও ইরাকী সৈন্যরা ২০০৫-এর ২৮ আগষ্ট অপহরণ করে। তাঁকে আল-মুথানা ব্রিগেডের সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন না বলার অপরাধে তাঁকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়। ১৪ মাস ধরে তাঁর উপর একনাগাড়ে নির্যাতন চলে। মোটা লাঠি, ধাতব পাইপ, ধাতব পাত ইত্যাদি দিয়ে প্রহার করা হয়। মূত্র বর্ধক ওষুধ মিশিয়ে তাঁকে প্রচুর জল খাওয়ানো হত, কিন্তু প্রস্রাব করতে দেওয়া হতো না। নিম্নাঙ্গে ওজন বেঁধে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। মাথা ও শরীরের চারপাশে গুলি চালিয়ে সদা মৃত্যুভয় দেখানো হতো। আবিদের স্ত্রী এবং মাকে জেলে ধরে নিয়ে এসে যৌন নির্যাতনের ভয় দেখানো হতো। খাবার দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। হাতের নখ উপড়ে নেওয়া হয়েছিল। হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো এবং সেই অবস্থায় মারধর চলত। প্রা দু'মাস তাঁর মাথা একটা থলি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। কেবল খাওয়ার সময়ে ঢাকা সরিয়ে নেওয়া হতো। বেশ কিছু বন্দীকে পাঁচমাস পর্যন্ত মুখ ঢাকা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকের শোওয়ার মতো জায়গা ছিল না। এর ওর গায়ের ওপর শুতে হতো। অনেকের দেহেই পোড়া-ঘষা অথবা অন্য কোন মারাত্মক ক্ষত ছিল। এমন কী কেউ কেউ যক্ষ্মা বা খোস-পাঁচড়ার মতো ছোঁয়াচে রোগের শিকার হয়ে পড়েছিল। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম সারতে হতো প্লাস্টিকের ব্যাগে। চারদিন অন্তর বন্দীদের শৌচাগারে নিয়ে যাওয়া হতো। ১৩ মাস বাদে আবিদকে আদালতে পেশ করা হয়। আদালত আবিদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রমাণ না পেয়ে, মুক্তির আদেশ দেয়। আরও এক মাস বাদে আবিদ জেলের বাইরে আসে, কিন্তু দশ হাজার মার্কিন ডলারের বিনিময়ে।

মোয়াজ্জাম বেগের মুখ থলি দিয়ে ঢেকে ক্রমাগত লাথি, ঘুষি, মারধর, অকথ্য গালাগালি চালানো হয়েছে। ভয় দেখানোর জন্য শরীর ঘেঁষে কুকুর গর্জন করতো। পিছমোড়া করে হাত বেঁধে হাঁটু ভেঙ্গে ২৪ ঘণ্টা এফবিআই-এর জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। জাত এবং ধর্মের জন্য তাঁকে অপমান সইতে হয়েছে। বাগরামে নির্জন কক্ষে তাঁকে সিআইএ, এফবিআই, মার্কিনী সেনা গোয়েন্দা বাহিনী ১১ মাস ধরে অবিরত জেরা করেছে। গুয়ান্তানামো বে-তে ২০ মাস তাঁকে আলো-বাতাস হীন এক নির্জন খুপরিতে আটক রাখা হয়েছিল।

জামিলাকে তো অর্ধনগ্ন অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছিল। আলি সাহালকে ইলেকট্রিক তার দিয়ে বেঁধে, শক দেওয়া হতো।

ট্রাইব্যুনালের বিচারে প্রকাশ পায়, প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০২-এর ৭ ফেব্রুয়ারী এক নির্দেশ জারি করে ঘোষণা করেছিলেন, আল-কায়দা বন্দীদের ক্ষেত্রে জেনেভা ঘোষণা প্রযুক্ত হবেনা, কারণ তারা 'জঙ্গি', যুদ্ধ বন্দী নয়। এই অজুহাতে বন্দীদের উপর নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড, ১৯ জানুয়ারী ২০০২ তারিখে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আল-কায়দা ও তালিবানী বন্দীদের ক্ষেত্রে, সিআইএ জেনেভা ঘোষণা উপেক্ষা করতে পারে।

ডিক চেনি, ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে সমস্ত আদেশ এবং জেনেভা ঘোষণার লঙঘন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ২০০৬ সালে, সেনেটর জন ম্যাককেইন আমেরিকায় জেলবন্দীদের প্রতি 'নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর' ব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 'ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন' বিলে এক সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন, চেনির উদ্যোগেই সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল।

অর্থাৎ পর্যবেক্ষনে দেখা যাচ্ছে, (সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে) প্রেসিডেন্ট বুশ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট চেনি, প্রতিরক্ষা সচিব রামসফেল্ড, তাদের পরামর্শদাতাদের সহযোগিতায় এবং সিআইএ কর্তাদের মদতে, একযোগে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করেছে। রামসফেল্ডের ভাবনায় ছিল নিপীড়নের কৌশল, পরামর্শদাতারা আইন বাঁচিয়ে সেগুলি প্রয়োগের উপায় বাতলেছেন আর বুশ সেই কাজে অনুমোদন দিয়েছেন। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে

এবং সেটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ট্রাইবুনাল সভাপতি লামিন তাঁর আদেশে বলেন, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সহ অন্যান্য অভিযুক্তরা সন্দেহাতীতভাবে নির্যাতন ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে স্বয়ং এবং একযোগে আন্তর্জাতিক মিলিটারি ট্রাইবুনালের (নুরেমবার্গ চার্টার) ৬ নং ধারায় বর্ণিত নীতিভঙ্গের দায়ে দোষী। নুরেমবার্গ চার্টার ঘোষণা করেছিল, 'নেতা, সংগঠক, প্ররোচনাকরী এবং সহযোগী, যে কেউ যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা অথবা পরিকল্পিত ছক অনুযায়ী সেই কাজ সম্পাদন করে কিংবা চক্রান্তে লিপ্ত থাকে— তাহলে এই পরিকল্পনা সম্পাদনে, যে কোন একজনের দ্বারা কৃত কর্মের জন্য প্রত্যেকেই দায়ী হবে' (Leaders, organizers, instigators and accomplices participating in the formulation or execution of a common plan or conspiracy to commit war crimes are responsible for all acts performed by any person in execution of such plan.)। নুরেমবার্গ চার্টার এবং নুরেমবার্গ রায় আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মেনে নিয়েছে। মার্কিন সরকার প্রথামাফিক আন্তর্জাতিক আইন তথা নুরেমবার্গ চার্টার এবং নুরেমবার্গ রায়ের অধীন।

ট্রাইব্যুনাল আদেশ দেয়, অভিযোগকারীরা যে অপূরণীয় আঘাত ও ক্ষতির ভোগ করেছে, তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এই ট্রাইব্যুনালের রায় মানতে আইনত হয়তো কেউ বাধ্য নয়। কিন্তু সভাপতি লামিনের ভাষায়, 'এটা বিবেকের ট্রাইব্যুনাল'। এই রায় 'আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত', রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং নিরাপত্তা পরিষদে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ইরাকের দুজালি শহরে ১৪৮ জন নাগরিককে হত্যাপরাধে মার্কিনী অনুচররা সাদ্দাম হুসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল ফাঁসির আদেশের ২৪ বছর আগে। কাল্পনিক অভিযোগে ইরাক আক্রমণ এবং লক্ষ লক্ষ ইরাকিকে মৃত্যুপুরীতে প্রেরণ করার অপরাধে জর্জ বুশের তাহলে কী শাস্তি প্রাপ্য?

---

# অভিষেক-সুরেশ— মৃত্যু না হত্যা

**শ্যামল দাস**

ব্যারাকপুরের অভিষেক পাল ও কালিম্পঙের সুরেশ ভুজেল ছিলেন ১০ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে তরতাজা দুই যুবক। কলকাতা পুলিশে ৪০০০ পুরুষ কনস্টেবল ও ৫০ জন মহিলা কনস্টেবল নেওয়া হবে। আর তার জন্য শারীরিক যোগ্যতামানের পরীক্ষায় নেমেছিলেন ১০ লক্ষের বেশি যুবক ও ১ লক্ষের বেশি যুবতী। আবেদনকারীদের সংখ্যা ছিলো আরও বেশি। প্রাথমিক ছাঁটাইয়ের পর দাঁড়িয়েছিল ১০ লক্ষের বেশি যুবক আর ১ লক্ষের বেশি যুবতী।

পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল যে 'কলোসিয়ামে' তার পোষাকি নাম ঘোড়দৌড়ের মাঠ বা রেস কোর্স। জুন মাসের ৫-৬ তারিখ। সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ প্রচণ্ড দাবদাহে জ্বলছে। গরমে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ ছুঁয়েছে। সেই সময় ভরা দুপুরে অভিষেক-সুরেশদের দেড় কিলোমিটার 'দ্রুত দৌড়' দৌড়াতে হবে। যে বা যারা এগিয়ে থাকবে তার পৌঁছে যাবে কলকাতার পুলিশের কনস্টেবলের পদে চাকরির আর একটু কাছে।

প্রায় ৬৫ বছর বয়স্ক ভারতীয় গণতন্ত্রে অর্ধবেকার-ছদ্ম বেকারের সংখ্যা কত? তথ্য পরিসংখ্যানের কেতাবে, প্রধানমন্ত্রী-অর্থমন্ত্রী-বিরোধী নেতা-সমাজতন্ত্রী-সমাজগণতন্ত্রীর জ্বালাময়ী বা প্যানপ্যানে, জমাটি বা ম্যাড়মেড়ে ভাষণে অথবা প্ল্যানিং কমিশনের বারান্দায় পড়ে থাকা বাতিল কাগজে পাওয়া যাবে ভারতে বেকারের সংখ্যা মোট... কোটি... লক্ষ... হাজার...।

বর্তমান রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার বা তার আগের সরকার বা তারও আগের সরকার, মানে যখন যে দলের বা যে জোটের সরকার ছিল— বলবেন, তারা কত বেকারের চাকরি দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজ্যগুলির সরকারে আসীন আঞ্চলিক দলগুলির নেতা-নেত্রীরা— উন্নয়নপন্থী বা মা-মাটি-মানুষ পন্থীরা— কত বেকারের চাকরি দিয়েছেন বা দিতে চান বা একবছরের মধ্যেই দিয়েছেন— ইত্যাকার কাজিয়ার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। অভিষেক-সুরেশ— তরতাজা দুই যুবক চাকরিপ্রার্থীর কী হলো দেখা যাক।

না, দেড় কিলোমিটারের 'দ্রুত দৌড়ে' প্রান্তসীমায় তাঁরা দুজনেই পৌঁছতে পারেন নি। মধ্য দুপুরের প্রচণ্ড দাবদাহে 'কলোসিয়ামের' মধ্যেই তাঁরা লুটিয়ে পড়েন। কলকাতা পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের নিয়ে যান এসএসকেএম-এ। অভিষেক হাসপাতালে পৌঁছাবার পথে মারা যান। আর কালিম্পঙের পাহাড়ি যুবক সুরেশ কনস্টেবল হওয়ার স্বপ্নের সাথে পাঞ্জা কষে ১১ জুন সকালে হাসপাতালে মারা যান। কর্তারা বলেছেন বা বলবেন বা রিপোর্টে লিখবেন, ডাক্তারি মতে ওই দুই যুবক 'হিট স্ট্রোক' বা 'সান স্ট্রোকে' মারা গেছেন।

এর মধ্যে আসরে নেমে পড়েন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী। তিনি তৎক্ষণাৎ কনস্টেবল নিয়োগের 'শারীরিক যোগ্যতামান নির্ণায়ক' পরীক্ষা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। শহরে তাপপ্রবাহের সতর্কতার মধ্যে কেন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছিল বা পুলিশ কর্তারা কেন পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয় নি। এর মধ্যেই মহাকরণের অলিন্দ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, অভিষেকের বোনকে রাজ্য সরকার চাকরি দেবে। হয়ত সুরেশের পরিবারের জন্যও এমন ঘোষণা করা হবে। এই ঘোষণা শোনার পর চাকরিপ্রার্থী বাকি যুবকদের অনেকেই হয়ত

ভাবছেন, আমি কেন অভিষেক বা সুরেশ হতে পারলাম না। তাহলে অন্তত আমার ডুবন্ত পরিবারটা বেঁচে যেত।

বেকার-অর্ধবেকার-ছদ্মবেকার বাহিনী দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে প্রতি দিন। মজুরি বেঁধে রাখার বা আরও কমানোর অন্যতম প্রাক্‌শর্ত এটাই। এমনকি পুলিশেও ঠিকা নিয়োগ হচ্ছে 'সিভিক ভলান্টিয়ার্স' নামে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই ঘোষণা করেছিলেন, জঙ্গলমহলে ছত্তিশগড়ের ধাঁচে এসপিও নিয়োগ করা হবে। হয়েছেও। বিভিন্ন শিল্পে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করছেন ঠিকা শ্রমিকরা। কোথাও ডান কোথাও বাম শ্রমিক সংগঠন মালিক-ম্যানেজমেন্টের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করছে সরকারি ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির নিচে।

বাস্তব পরিসংখ্যানের চেয়েও অনেক নির্মম। এখনও কোনো বেসরকারি চ্যানেলে অভিষেক-সুরেশের মৃত্যুর কারণ নিয়ে 'টক-শো' হয়নি। যেখানে মৃত্যুর 'পক্ষে-বিপক্ষে' ভাগ হয়ে তথাকথিত নাগরিক সমাজ তুলোধোনা করবেন প্রতিপক্ষকে এবং 'টক-শো'র শেষে চ্যানেলের দেওয়া পারিশ্রমিকটি পকেটে নিয়ে নিজ নিজ বাড়ির পথ ধরবেন। কেউবা হয়ত দক্ষিণবঙ্গে বয়ে চলা তাপপ্রবাহের পথ ধরে পৌঁছে যাবেন 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'-এর তত্ত্বে। এবারে তীব্র গরমে মারা গেছেন যাঁরা তাঁদের তালিকায় আমরা দেখিনি কোনো আম্বানি... টাটা... বিড়লার নাম। পাইনি কোনো পার্লামেন্টারি দলের কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সম্পাদকের নাম। নেই কোনো রাজা... কানিকোঝি... দুরাপ্পার নাম। কারা মারা গেলেন? 'রামা কৈবর্ত' বা 'হাসিম শেখ'রা। বর্ধমানের রিক্সাচালক, পেনসন নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কোনো বৃদ্ধা বা কলকাতা শহরের কোনো চা বিক্রেতা। আর অবশ্যই, অভিষেক-সুরেশরা।

আজ থেকে প্রায় ১৬০ বছর আগে বলা হয়েছিল দুনিয়াটা ক্রমশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে মালিক আর মজুরে। আর মালিকরা প্রতিনিয়ত তাদেরই কবর খননকারীদের জন্ম দিয়ে চলেছে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মে। তারই ধারাবাহিকতায় ঘটেছিল বলশেভিক বিপ্লব বা আরও কয়েক বছর পর চীন বিপ্লব। সেগুলি আজ ইতিহাসের বিষয়। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের লড়াই থেমে থাকে নি। বিশ্বায়নরূপী আধুনিক ধনতন্ত্রের সূতিকাগৃহে আজ যুবকরা শ্লোগান তুলছেন, আমরা ৯৯.৯ শতাংশ আর তোমরা ০.১ শতাংশ। ধনতন্ত্রের সংকট ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে আটলান্টিকের দুধারেই। এমনকি আমাদের দেশেও।

চীন বিপ্লবের রূপকার কমরেড মাও জনৈক চীনা যুবতীকে শহিদের সম্মান জানিয়েছিলেন কারণ তিনি পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। অভিষেক-সুরেশও তীব্র বেকারির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। তাঁদের কি আমরা পারি না শহিদের মর্যাদা দিতে?

## সীমা আজাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড : গণতান্ত্রিক বিরোধিতার কণ্ঠরোধের নবতম দৃষ্টান্ত

উত্তর প্রদেশে পিইউসিএল-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও 'দস্তক' পত্রিকার সম্পাদক সীমা আজাদ ও তাঁর স্বামী বিশ্ব বিজয়কে এলাহাবাদের অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে। ২০১০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীতে সীমার ভাইয়ের বাড়ি থেকে এলাহাবাদে ফিরবার পথে ইউপি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাঁদেরকে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' চালানোর অভিযোগে কালা কানুন ইউএপিএ-তে গ্রেপ্তার করেছিল, এবং পরে ইউপি-র অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াডের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। পিইউসিএল থেকে জমি-মাফিয়াদের বেআইনি কার্যকলাপের ও সরকারি সন্ত্রাসের বিরোধিতা করার 'অপরাধে' তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তখনই অভিযোগ তোলা হয়েছিল।

সারা দেশের মানবাধিকার কর্মীরা সঠিকভাবেই এই কারাদণ্ডকে 'বিরোধী মতামতের কণ্ঠরোধের নবতম দৃষ্টান্ত' বলে আখ্যা দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে সীমা গণআন্দোলনের কাজে—প্রথমে ছাত্র এবং পরে নারী ও মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। ওই প্রদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে আরো জনপ্রিয় ও সোচ্চার করে তোলার লক্ষ্যে তিনি 'দস্তক' পত্রিকাটি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকায় উত্তরপ্রদেশে গঙ্গা এ'প্রেসওয়ে তৈরি করতে গিয়ে যে হাজার হাজার কৃষকের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করা হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণের প্রকাশ সরকারকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। তাছাড়া আজমগড়ে কয়েকজন মুসলিম যুবককে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার ও অমানুষিক নির্যাতনের বিবরণও তিনি প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত সেই যুবকেরা কিন্তু 'নির্দোষ' প্রমাণিত হন। এ সব কিছুই তাঁর এবং এসব কাজের সহযোগী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে সরকারকে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে প্রণোদিত করেছিল বলে ওই রাজ্যের অসংখ্য মানুষের ধারণা। ফলত, একজন মানবাধিকার কর্মীকে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল 'রাষ্ট্রবিরোধিতা'র অভিযোগে।

নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক পন্থার নৃশংস অনুশীলনের বিরুদ্ধে ক্রমপ্রসারমান গণআন্দোলনের টুঁটি চেপে ধরার লক্ষ্যে আমাদের দেশের সীমিত গণতন্ত্রকেও আরও সীমিত করে তোলার এবং প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার চক্রান্তের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের তালিকায় সীমা ও তাঁর স্বামীর কারাদণ্ডের ঘটনাটি আর একটি নতুন সংযোজন। **ধীরেন চৌধুরী**

# সমালোচনামূলক শিক্ষণপদ্ধতির সপক্ষে: একটি পিটিশন

**(এনসিইআরটি-র পাঠ্যপুস্তকে কার্টুন নিয়ে সম্প্রতি যে বিতর্ক উঠেছে সে নিয়ে একটি পিটিশন)**

ভারতের লোকসভার ভেতরে ও বাইরে যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলো আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি। একটি বিশেষ কার্টুন নিয়ে হইচই, সেখান থেকে বাড়তে বাড়তে এখন এনসিইআরটির নতুন পাঠ্যপুস্তকগুলির উপরই ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক বিষয়ক একজন উপদেষ্টার অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে। সরকার স্থির করেছেন, পাঠ্যপুস্তকে এইসব আপত্তিকর জিনিসগুলি কারা ঢুকিয়েছে তা নিয়ে তদন্ত করা হবে। এটা পরিষ্কার যে শুধুমাত্র স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের পাতায় কার্টুন থাকবে কিনা শুধুমাত্র সেটাই চিন্তার বিষয় নয়।

তবে কার্টুন নিয়ে ভীতিও গুরুত্বহীন নয়। এ থেকে আমাদের আজকের গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। জহরলাল নেহরু শংকর পিল্লাইকে বলেছিলেন, "শংকর, আমাকেও ছাড় দিও না।" যে কার্টুনটিকে এখন আপত্তিকর বলা হচ্ছে বি আর আম্বেদকর নিজে সেটি দেখেছিলেন। তাঁর আপত্তি হয় নি। নেহরু ও আম্বেদকরের মত মহান গণতান্ত্রিক ব্যক্তিরা জানতেন কার্টুন কী। তাঁরা জানতেন যে শংকর বা লক্ষণের মতো সৃজনশীল কার্টুনিস্ট সব কিছু মেনে নেওয়ার বদলে আমাদের প্রশ্ন করতে শেখান, ব্যক্তির মধ্যে যেসব দ্বন্দ্ব আছে, দ্ব্যর্থতা আছে সেগুলি তাঁরা প্রকাশ করেন, সব কিছুকে নতুন আলোয় দেখতে শেখান। আমাদের দেশে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ঐতিহ্য পুরনো। হাস্যকৌতুকের ক্ষমতাকে শুধু সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রেই নয়, শিশুসাহিত্যেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই ঐতিহ্যকে তুলে ধরলে আসলে গণতন্ত্রকেই তুলে ধরা হয়। অগণতান্ত্রিক দেশেই শুধু কার্টুনকে ভয় পাওয়া হয়। এনসিইআরটি-র নতুন পাঠ্যপুস্তকে যেসব কার্টুন ব্যবহার করা হয়েছে তা করা হয়েছে শিক্ষণের উদ্দেশ্যে। ছবি, পোস্টার, ম্যাপ, গল্পগাথা, আসল সূত্র থেকে নির্যাস— এ সবের পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে কার্টুনও। তা করা হয়েছে ছাত্রদের মনকে ব্যাপৃত রাখার জন্য, তাদের সমালোচনামূলকভাবে ভাবতে সাহায্য করতে, তাদের এটা বোঝাতে যে বর্তমান ও অতীতকে বোঝার ক্ষেত্রে ছবি ধরনের জিনিসও আমাদের সাহায্য করে। সারা বিশ্ব জুড়ে ছাত্রদের মনকে প্রশিক্ষিত করার জন্য, বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাকে জোরদার করার জন্য সেরা সেরা পাঠ্যপুস্তকে এসব শিক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আমরা যখন শিশুদের বিচার করার ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করি, তখন আসলে আমরা তাদের ছোট করি। আমরা যদি মনে করি যে ১৬ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীরা নেহাত ছেলেমানুষ, তাদের মনে বাইরের প্রভাব পড়ে বেশি, তাদের বাইরের জগত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তখন আমরা আসলে তাদের ওপর মুরুব্বিয়ানা করি। সংবাদপত্র, ইন্টারনেট, রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমার মাধ্যমে যখন তাদের কাছে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছায় তাতে আমরা বাধা দিতে পারি না। এই সব যে তথ্য ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে সেগুলি বিচার করার ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই পাঠ্যপুস্তকগুলিতে। সমালোচনামূলক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার বদলে যদি আমরা ভয় পাই, তাতে আমাদের গণতান্ত্রিক চিন্তার দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক যেভাবে এ নিয়ে এগিয়েছেন তাতে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এনসিআরটি-র এই নতুন পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার নানান স্তরে নানা কমিটি ও সাবকমিটি তৈরি হয়েছে। সারা দেশ থেকে ৩০০-র বেশি অ্যাকাডেমিক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক মিলে তীব্র আলাপ-আলোচনার পর ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ২০০৫ তৈরি হয়। পাঠ্যপুস্তকগুলি তৈরি হয় যৌথ প্রচেষ্টায়। এক একটি টিম পাঠ্যপুস্তক লেখে, তার প্রতিটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে, পরিমার্জনা করা হয়েছে। তারপর প্রখ্যাত অ্যাকাডেমিকদের নিয়ে তৈরি একটা বিশেষ মনিটরিং কমিটি এই পাঠ্যপুস্তকগুলির পর্যালোচনা করেছে। এখন হঠাৎ করে এই সমস্ত কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সঠিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে গঠিত সব কমিটির কাজকর্ম নাকচ করে দেওয়া হলো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত পাঠ্যপুস্তক বাতিল করে দেওয়ার এই হঠাৎ-সিদ্ধান্ত এবং এইসব বিষয় যাকে এখন 'আপত্তিকর' বলে তদন্ত শুরু করা হচ্ছে, তাতে সমালোচনামূলক চিন্তার অধিকারে যারা বিশ্বাস করেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পবিত্রতাকে যারা সম্মান করেন, তাদের সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ আছে।

প্রতিটি প্রজন্মকেই এমন পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হয় যা আগের থেকে আলাদা। প্রতিটি প্রজন্মকে নতুন করে সৃজনশীল ভাবে সেই পাঠ্যপুস্তক লিখতে হয়। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিতর্ক করতে হয়, পরিমার্জনা করতে হয়, আর এই প্রক্রিয়াটি চালাতে হয় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের থেকে মতামত নিয়ে। কিন্তু এটি একটি অ্যাকাডেমিক প্রক্রিয়া; যৌথ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যা সবাইকে নিয়ে করতে হয়। এ ব্যাপারে সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষতি করতে বাধ্য।

আমরা আশা করি যে শেষ পর্যন্ত যুক্তির জয় হবে, কয়েকজন ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তির জন্য নতুন ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ২০০৫ থেকে লব্ধ সব ফল বিনষ্ট করা হবে না, নতুন পাঠ্যপুস্তকগুলি সেন্সার করা হবে না, ক্ষতবিক্ষত করা হবে না, শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হবে না। নবগঠিত রিভিউ কমিটি কাজ শুরু করা আগেই যে এ বছর ছাত্ররা ঐ পাঠ্যপুস্তকগুলি পড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেটা দুঃখজনক।

**ড. সারদা বালাগোপালন, সিএসডিএস; অধ্যাপক নীলাদ্রি ভট্টাচার্য, সিএইচএস, জেএনইউ; অধ্যাপক জানকি নায়ার, সিএইচএস, জেএনইউ; অধ্যাপক কুমকুম রায়, সিএইচএস, জেএনইউ; অধ্যাপক হরি বাসুদেবন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।** ১৯ মে ২০১২

# কেমন আছে জঙ্গলমহল

বিশ্বজিৎ রায়

রাজ্যে পালাবদলের পর এক বছর কেটে গিয়েছে। পরিবর্তনের জমানায় কেমন আছেন জঙ্গলমহলের মানুষ? সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর লালগড় আন্দোলনের সুফল কুড়িয়ে যারা ক্ষমতায় এলেন, তারা বিগত বাম-জমানার নির্যাতিত মানুষজনের ক্ষতে কতটা প্রলেপ দিতে পারলেন? নির্বাচন-পূর্ব প্রতিশ্রুতি কতটা পালিত হল? পুলিশি-সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বে আদিবাসী-মূলবাসী মানুষের যে আন্দোলনের জেরে দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে এসেছিল জঙ্গলমহল, আজ তা ছত্রভঙ্গ, বিধ্বস্ত এবং কার্যত স্তব্ধ। অনেক সম্ভাবনা জাগিয়েও কেন এমন পরিণতি হল? এর জন্য কতটা দায়ী ভঙ্গ-বঙ্গের আজকের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস? কতটাই বা দায়ী সিপিআই(মাওবাদী) দলের নেতৃত্ব, যারা আড়াল থেকে আন্দোলনের রাশ ধরেছিলেন গোড়া থেকেই? আন্দোলনের দিনগুলোয় ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিলেন, পুলিশ এবং পরবর্তীকালে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথবাহিনীর অত্যাচার, লাঠি-গুলির শিকার যারা হয়েছেন ; সেই গরিব আদিবাসী (মূলত সাঁওতাল) এবং মূলবাসী (মূলত মাহাতো) সম্প্রদায়ের মানুষজন কী বলছেন?

ফিরে দেখার পাশাপাশি পরিবর্তিত জঙ্গলমহলের ছবিটাই বা কী? রাজ্য সরকার ও মাওবাদীদের মধ্যে প্রস্তাবিত শান্তি আলোচনা শুরুর আগেই ভেস্তে যাওয়ার পর যৌথবাহিনীর অভিযান জোরদার হয়। গত নভেম্বরে বাহিনীর ঘেরাও-অভিযানে কোণঠাসা কিষেণজির তথাকথিত 'সংঘর্ষে'-মৃত্যুর পর মাওবাদীদের সশস্ত্র স্কোয়াড ছত্রভঙ্গ। দূরের জঙ্গলে হটে গেছেন অনেকে। অনেকে আবার শিহরণ-জাগানো গেরিলা উর্দি আর বন্দুক নামিয়ে রেখে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিং-এর আলোকিত অলিন্দে দাঁড়িয়ে 'মূলস্রোত'-এ ফেরার অঙ্গীকার করেছেন। এর ফলে, সরকার ও শাসকদলের দাবি : জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরেছে। এবার উন্নয়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সরকার। কিন্তু বিরোধীরা বলছেন : এই শান্তি শ্মশানের শান্তি। যৌথ বাহিনীর প্রহরা ও প্রশ্রয়ে লালিত শাসকদলের ভৈরববাহিনীর সন্ত্রাসের জোরে আরোপিত শান্তি। এই অভিযোগ শুধু মাওবাদীদের নয়, সিপিএম এবং অন্যান্য দলেরও। কতটা সত্যি এই অভিযোগ? আমজনতাই বা কী বলছেন?

এহেন নানা প্রশ্ন নিয়ে লালগড় ও ঝাড়গ্রাম সন্নিহিত কিছু গ্রামে গিয়েছিলাম। সঙ্গী ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ও প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মী নন্দিনী সুন্দর। অল্প সময়ে জঙ্গলমহলের সব প্রান্ত ঘোরার সুযোগ ছিল না। যেটুকু ঘুরেছি কথা বলেছি সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে। বুঝতে চেষ্টা করেছি তাদের প্রকৃত মনোভাব এবং তার নেপথ্যের কারণগুলি। সব প্রশ্নের উত্তর কদিনের ঝাঁকি দর্শনে পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আপাতঃ-শান্তির বাইরের পরতটা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই বোঝা যায় বহিরাগত আগন্তুকদের সম্পর্কে মানুষজনের ভয়-তরাস। জঙ্গলমহলে রক্তপাত কমেছে। পথে-ঘাটে বুলেটবিদ্ধ, পিছমোড়া করে হাতবাঁধা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে নেই। জঙ্গলে-ঘেরা দুর্গম গ্রামগুলি ছাড়া সিআরপি তল্লাসি, মারধোর, ধরপাকড় আগের তুলনায় কম। দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক ছন্দও অনেকটাই ফিরেছে। সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে আড্ডা জমছে। বাজারহাট চলছে। জঙ্গল-লাগোয়া রাস্তায় গাড়িঘোড়াও চলছে আলো ডোবার পরও। কিন্তু আন্দোলনের পক্ষে--বিপক্ষে যুযুধান শিবিরগুলির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে জুড়ে-যাওয়া মানুষগুলির ক্ষতগুলি এখনও শুকোয়নি। বড় রাস্তা বা জঙ্গলের প্রান্তবর্তী সিআরপিএফ ক্যাম্পগুলি ঘিরে কাঁটা তারের বেড়া, ট্রিগারে আঙ্গুল-রাখা প্রহরীদের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি জরিপ আর মাইন-নিষ্ক্রিয়কারী গাড়িগুলির অস্তিত্ব অনতি-অতীতের যুদ্ধাবস্থার কথা মনে পড়ায়। জঙ্গলে--ঘেরা গ্রামগুলিতে যেতে স্থানীয় গাড়িচালকদের দিনমানেও অনীহা-অস্বস্তি। সন্ধ্যায় জঙ্গলপথে ফেরার সময়ে পিছনে ধাবমান মোটর সাইকেলবাহী যুবকদের মাওবাদী সন্দেহে আতঙ্কে দিশাহারা আমাদের গাড়িচালক তার সাবধানবাণী না শোনায় উষ্মায় ফেটে পড়েন। একই তরাস তার সিআরপিএফ শিবিরগুলির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়। এই বুঝি রাস্তা আটকে দাঁড়ালো বন্দুক-উঁচোনে সরকারি বাহিনী। শুরু হয়ে যাবে মারধোর, খিস্তিখেউড় এবং তারপর অবধারিত হাজতবাস। কদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জঙ্গলমহলে তার সাম্প্রতিকতম জনসভায় স্থানীয় মানুষদের বহিরাগতদের দেখলেই নজরে রাখার এবং তাদের জিজ্ঞসাবাদ করার পরামর্শ দিয়ে গেছেন। স্পষ্টতই জয় করেও তাঁর ভয় যায়নি। মাওবাদীরা ফের যাতে ঘাঁটি না গাড়তে পারে সে কারণেই তার সতর্কবার্তা, সে কথা খোলসা করেই ঘোষণা তাঁর।

এহেন পরিস্থিতিতে মানুষজনের মনের কথার হদিশ পেতে গেলে তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে। হঠাৎ-গমনে এবং ঝাঁকি-দর্শনে তা সম্ভব নয়। তবু চেষ্টা করেছি আঁচ পেতে। সব পক্ষের মতামত জানতে। কিন্তু অসম্পূর্ণতা থেকেই গেল। এবারের প্রথম পর্বের প্রতিবেদনে আমরা বাম আমলে নির্যাতিত কিছু

মানুষের বর্তমান পরিস্থির কথা জানাব। দ্বিতীয় পর্বে রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলি আসবে।

**ছোটপেলিয়া**

ছোটপোলিয়া। ছিতামণি মুর্মুর গ্রাম। সেই ছিতামণি যার বাঁ চোখটা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় পুলিশি অত্যাচারে। ২০০৮ সালের ৫ নভেম্বর কাকভোরে স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে রাইফেলের কুঁদোর আঘাত নেমে আসে তার চোখে। দোসরা নভেম্বর লালগড় থেকে বহুদূরে শালবনিতে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস সেরে ফিরছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মেদিনীপুর শহরের অদূরে তার কনভয়ে মাইন বিস্ফোরণ। সন্দেহের তীর মাওবাদীদের দিকে। সেই মাওবাদীদের ধরতে ছোটপেলিয়া বড়পেলিয়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে পুলিশি অভিযান ও অত্যাচারের পরিণামে ছিতামণির অঙ্গ হানি, লক্ষ্মীমণি প্রতিহারের গর্ভপাত। এরকম আরও কয়েকজন আদিবাসী এবং মূলবাসী মহিলা গুরুতর আহত হন। এরই প্রতিবাদে পথে নামেন হাজার হাজার মানুষ। উত্তাল হয়ে ওঠে জঙ্গলমহল। জন্ম নেয় পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি। তারপর যা ঘটে তা আজ ইতিহাস।

কিন্তু কেমন আছেন সেই ইতিহাসের অন্যতম নায়িকা? আন্দোলন আজ ইতিহাস হলেও তিনি ও তার পরিবার-পরিজনের জীবন তো থেমে নেই। তাদের বারোমাস্যার কোনও পরিবর্তন হল কী? মনে এসব প্রশ্ন নিয়ে লালগড়-কাঁটাপাহাড়ির মূল সড়ক ছেড়ে রাঙ্গামাটির এবড়োখেবড়ো পথে বেশ কয়েকটি গ্রাম পেরিয়ে শেষ বিকেলে পৌঁছলাম ছিতামনিদের সাঁওতালপাড়ায়। আধা অ্যাসবেস্টস, আধা খড়ের ছাউনি ঢাকা মাটির বাড়িটির সামনেই এক বৃদ্ধ বাঁশ কেটে বাখারি তৈরি করছিলেন। পথপ্রদর্শক স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্মী পরিচয় করিয়ে দিলেন— গোরাচাঁদ মুর্মু, ছিতামণির স্বামী। ছিতামণির খোঁজে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন পথ-প্রদর্শক। বেশ কিছুদিন পর বেশ অনিচ্ছুকভাবেই বেরিয়ে এলেন ছিতামণি। বিগত কয়েক বছরে বারংবার মিডিয়া-হানায় বিব্রত ও বিরক্ত এই মধ্যবয়সিনী মহিলা দৃশ্যতই হতাশ। আমাদের সামনে তার মনোভাব গোপন করলেন না।

''কত কত বাবুদের তো বলেছি আমার কথাটা। কী লাভ হইঁছে? আমার চোখটা গেল। কেউ দেখছে আমাকে?''

বেশ ঝেঁঝে উঠে বললেন তিনি। ছিতামণির হাতে তার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র আর ওষুধের শিশি আর ফয়েল। সবই ফাঁকা। জানালেন, চিকিৎসা আর চলছে না। ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই তাঁর পরিবারের। ঝাড়গ্রাম বা কলকাতায় গিয়ে ওষুধপত্র সংগ্রহ করার জন্য গাড়ি ভাড়া জোটানোও দুষ্কর ক্ষেতমজুর পরিবারটির। বাঁ চোখটি তো গেছেই। ডান চোখটিতেও দৃষ্টিশক্তি অতি ক্ষীণ। কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেল কলকাতার রিজিউন্যাল ইন্সটিটিউট অফ অপথ্যালমলজিতে তাকে ভর্তি করা হয় ২০ নভেম্বর, ২০০৮। অর্থাৎ, চোখে গুরুতর আঘাত লাগার ১৫ দিন পরে। পুলিশের ভয় আর অর্থকষ্টের কারণে তার আগে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় নি, বললেন ছিতামণির ছেলে। ততদিনে ক্ষতি যা হবার হয়ে গিয়েছে। অঙ্গহানি ছিতামণির জীবনে আর্থিক সংকট তীব্রতর করেছে। তার কথায়, দৃষ্টি হারানোর আগে তিনি খেতমজুরি করে দিনে ছয় কেজি ধান আর একবেলার খোরাকি পেতেন। ছয় কেজি ধান থেকে কেজি তিনেক চাল হত। টাকার অঙ্কে ৭০-৮০ টাকা মজুরি। স্বামী আর তিন ছেলে জনমজুরি, ঘরামির কাজ বা অন্যান্য টুকিটাকি কাজ করেন। তাদের রোজগারের সঙ্গে জুড়ত ছিতামণির দৈনিক আয়টুকুও। এতে অন্তত ভাতের কষ্টটুকু ছিল না। কিন্তু কার্যত দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ার পর মাঠে আর তিনি কাজ করতে পারেন না। এই দুমূর্ল্যের বাজারে তাঁর আয়টুকু চলে যাওয়ায় আঁচ লেগেছে সংসারে।

পুলিশের কর্তারা এখনও সেদিনের অভিযানের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে বলেন, কিষেণজির ডেপুটি বিকাশ ওরফে সিংরাই টুডু সহ কয়েকজন মাওবাদী সেই রাতে ছোটপেলিয়া ও আশেপাশে লুকিয়েছিল। ছিতামণি সহ আহত মহিলারা নাকি সবাই পুলিশের উপর চড়াও হন এক সন্দেহভাজন মাওবাদীকে গ্রেফতারের সময়। কিন্তু ছিতামণি ও তার পরিবার এবং প্রতিবেশীরা আজও পুলিশি বয়ান অস্বীকার করছেন। ছিতামণির কথায়, তিনি ও তার স্বামী নিজেদের ঘরে শুয়েছিলেন। মাওবাদীদের খোঁজে দরজা ভেঙ্গে পুলিশ ঢোকে এবং গোরাচাঁদবাবুকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ছিতামণি বাঁধা দিতেই শুরু হয় গালিগালাজ, মারধোর। বন্দুকের কুঁদোর আঘাত নেমে আসে তার চোখে মুখে। পাশের বাড়িতেই অতিথি ছিলেন এক বহিরাগত শ্রমিক-ঠিকাদার। পুলিশ তাকেও তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে সে বাড়ির মেয়েরা ও প্রতিবেশিনীরা বাধা দেন। ''তিনি ছিলেন আমাদের মনিব। আমাদের অভাবের দিনে নামালে খাটতে নিয়ে যেতেন তিনি।'' বললেন শীতল হাঁসদা। লালগড়ে এখন ধান আলু ইত্যাদি দুফসলি, তিনফসলি জমিতে চাষ হলেও বর্ধমান, হুগলীর মতো দূরবর্তী জেলায় মজুরি খাটতে যান এখানকার বহু মানুষ বাড়তি মজুরির টানে এবং সিজন-ভর কাজের আশায়। মনিবকে তাদের 'ঘরের লোক' বলেই মানেন স্থানীয় সাঁওতালরা। তাকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশি আক্রমণের মুখে পড়েন আদিবাসী মেয়ে-বৌরা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার এবং দল তাদের মাওবাদী তকমা দেয়।

আন্দোলনে নেমে জনসাধারণের কমিটি অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের ক্ষমা প্রার্থনার দাবি করেছিল। আদিবাসী মহিলাদের 'ইজ্জত'-এর প্রশ্নটিকে সামনে রেখে দোষীদের স্থানীয় দলিলপুর

চকে এসে নাকে খত দেওয়ার, দাবিও তুলেছিল। জনগণের সেবক বাম সরকার পুলিশকে 'জনগণের সেবক' বললেও নির্যাতিত মানুষের কাছে উর্দিধারী সরকারি বাহিনীর ক্ষমাপ্রার্থীর দাবিকে রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে অবমাননাকর এবং নির্বাচিত সরকারের দৌর্বল্যের প্রকাশ জ্ঞানে খারিজ করে দেয়। সেদিনের বিরোধী নেত্রী, আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিতামণিদের উপর পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন। কলকাতা ও জঙ্গলমহলের বিভিন্ন সভায় তিনি পুলিশ ও পরবর্তীকালে যৌথবাহিনীর দমন-পীড়নের নিন্দায় মুখর হন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর সরকার ও সিপিএমের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ছিতামণি-কাহিনী হয়ে ওঠে তাঁর দলের অন্যতম হাতিয়ার। স্বভাবতই অপেক্ষা ছিল পালাবদলের পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী, নিদেনপক্ষে তার প্রতিনিধিরা, ছিতামণির সঙ্গে দেখা করবেন। তার চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে। তার পরিবারের বারোমাস্যা বদলাবে। এই আশা সঙ্গত, কারণ বিপুল জনাদেশে ক্ষমতায় আসার পর জঙ্গলমহল সহ রাজ্যের মানুষের একদিন-প্রতিদিনের জীবনে পরিবর্তন আনার দায়িত্ব মমতার। জঙ্গল মহলের আমজনতার স্বার্থরক্ষার দাবিদারও তিনি। কিন্তু বিগত এক বছরে ছিতামণির কাছে সরকার বা শাসকদলের কোন প্রতিনিধিও আসেননি। নির্যাতিতা মহিলা সুবিচার পাওয়া দূরে থাক, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছতেও পারেননি।

"কেউ আসে নাই আমার কাছে। আমি যদি মমতার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম তাহলে সে বিশ্বাস করত আমার উপর কী জুলুম হঁইছি—" আক্ষেপের সঙ্গেই বললেন ছিতামণি। দোষী পুলিশকর্মীদের শাস্তি দূরে থাক, চিকিৎসায় সরকারি বা শাসকদলের সাহায্যও মেলেনি। এমন নয়, ছিতামণি চেষ্টা করেন নি। স্থানীয় তৃণমূল নেতা ক্ষমানন্দ মাহাতো বড়পেলিয়ার বাসিন্দা। ছিতামণিদের উপর পুলিশি জুলুমের দিন তাঁর বাড়িতেও চড়াও হয় পুলিশ বাহিনী। মারধোর জুটেছে তাঁর কপালেও। তিনি জানালেন, ছিতামণির চিকিৎসা ও অঙ্গ হানিজনিত ক্ষতিপূরণ বিষয়ে দলের নেতা মন্ত্রীদের কাছে আর্জি জানিয়েও লাভ হয় নি। "মুখ্যমন্ত্রীর লালগড় সভার দিন আমি তার সঙ্গে ছিতামণির দেখা করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আমাকে জানানো হয় এটা সরকারি কার্যক্রম। দলের স্থানীয় নেতারাও মঞ্চে উঠতে পারবেন না"— মাহাতো জানালেন। তাঁর কথায়, কিছুদিন আগে সিজুয়ায় দলের এক কর্মীসভার ফাঁকে ঝাড়গ্রামের বিধায়ক এবং পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সুকুমার হাঁসদার সঙ্গে ছিতামণির দেখা হয়। মন্ত্রী নিশ্চিত হন ছিতামণির একটি চোখ চিরতরে নষ্ট। কিছু করার প্রতিশ্রুতি দেন বটে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় নি।

এ বিষয়ে মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁর উবাচ শোনা যাক। "আমি জানি না সরকার থেকে ছিতামণিদের জন্য কোনও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে কিনা। কোন স্কিমে কী ধরনের ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে দেখতে হবে। আরে চাইলেই কি দেওয়া যায়! অনেক কিছু খতিয়ে দেখতে হয়। হাতিতে পিষে মারলে বা সাপে কাটলেও অনেকে ক্ষতিপূরণ চায়। তাহলে তো তারা চাইলেই দিতে হবে।" ভেবে দেখুন হাঁসদা একদা পেশায় চিকিৎসক, ঝাড়গ্রামেই মানুষ এবং নিজেও আদিবাসী। এহেন মন্ত্রী পুলিশি জুলুমের শিকার ছিতামণি, পরিবর্তনকামী জঙ্গল মহলের অন্যতম মুখ ছিতামণির যন্ত্রণাকে কোন্ চোখে দেখছেন! এটা ঘটনা, বন্য পশুর আক্রমণে প্রাণহানি বা অঙ্গহানি ঘটলে এদেশে সরকারি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার নাগরিকদের জন্য এহেন কোনও সংস্থান নেই, অন্তত প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগতভাবে। এই প্রসঙ্গে পরে আসব। কিন্তু মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট, সরকার ও শাসকদল ছিতামণিদের রাষ্ট্র-নির্যাতিতের স্বীকৃতি দিতে রাজি নয়। কারণ, নোয়াম চোমস্কির ভাষায়, তিনি ভোটের আগে Worthy Victim বা সিপিএম-বিরোধী প্রচারের পক্ষে 'মূল্যবান' হলেও মাওবাদীদের সঙ্গে মমতার নির্বাচন-পূর্ব সমীকরণ বদলে যাওয়ায় তিনি এখন unworthy Victim, 'মূল্যহীন'। ছোটপেলিয়ার মানুষের গায়ে যে মাওবাদী তকমা! অন্যদিকে সিপিএমের জমানায় পুলিশকে অত্যাচারী ও শাসক দলের বংশবদ বলে গালমন্দ করলেও এখন ক্ষমতায় বসার পর যে সেই পুলিশকে চটানো সম্ভব নয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর। সেই পুলিশই তার শাসনযন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার। সামান্য এক ক্ষেতমজুর সাঁওতাল নারীর জন্য ক্ষমতাতন্ত্রের অঙ্ক কি বদলে দেওয়া যায়!

ছিতামণি অবশ্য ক্ষমতাবানদের পাশাখেলার নিয়মকানুন জানেন না। রাষ্ট্র-নির্যাতিতের স্বীকৃতি আদায়ের লড়াই তার মতো প্রান্তীয় মানুষের সম্ভব নয়। তিনি শুনেছেন, সরকার নাকি তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু অঙ্কটা কেউ বলে পাঁচ হাজার, কেউ বলে পঞ্চাশ হাজার। স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীও অঙ্কটি সম্পর্কে নিশ্চিত নন। তিনিও শুনেছেন ওটা এক লক্ষ টাকা। অধিকারীর উল্টে প্রশ্ন, "অ্যাপ্লাই করেনি কেন ছিতামণি?" উদ্দিষ্ট প্রাপককে কোনও সরকারি কর্তা গাঁয়ে এসে বলবার প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে ছিতামণি এককালীন ক্ষতিপূরণের অনিশ্চিত বুনো হাঁসের পিছনে ছুটতে চান না। তার বদলে তিনি মাসিক মাসোহারা বা তাঁর ছেলেদের জন্য চাকরির সংস্থানে আগ্রহী। "ওই কটা টাকা দিয়ে আমার কী হবে? কদিন চলবে? অভাবের সংসারে ওই টাকা ধরে রাখতে পারব কি? তার চেয়ে সরকার ছেলেদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে দিক। নয়তো আমাকে মাসে মাসে ভাতা দিক— বললেন তিনি। অধিকারী এবং হাঁসদা দুজনেই বললেন, ছিতামণি অ্যাপ্লাই করলে এ ব্যাপারে তারা তদবির করতে পারেন। স্পষ্টতই তাঁদের

গরজ নেই। মাওবাদীদের হাতে নিহত তৃণমূল-কর্মী নেতা বা দলের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা মাও-বিরোধী নেতাদের পরিবারকে চাকরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার পিছনে, মুখ্যমন্ত্রীর সভায় দলীয় শহিদের স্ত্রী-সন্তানদের মঞ্চে হাজির করানোর নেপথ্যে যে রাজনীতির বাধ্যবাধকতা ক্রিয়াশীল তা ছিতামণিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বোঝা যায়, মৃত্যু বা নির্যাতনের মাপকাঠিতে সবাই সমান নয়। বাম আমলেও ছিল না। পরিবর্তিত জমানাতেও নয়। এখানেও সেই চোমস্কীয় শ্রেণী বিভাজন।

ছিতামণি এসব তাঁর মতো বোঝেন। চলমান গেরিলা যুদ্ধ বা ঘাঁটি এলাকা স্থাপনের নীল নকসা অথবা পরিবর্তন-এর জাদুর ছড়ি বুলিয়ে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের সখ্য ও বৈরিতার কালপর্ব পেরিয়ে আপাতত তিনি রোমাঞ্চহীন বর্তমানে বন্দী। আন্দোলনের জোয়ার শেষে বিভ্রান্তি, দোষারোপ আর কলুষময় ভাটার পর্বে অধিকাংশ মানুষের মতো তিনিও একা। তাই তিনি অনতি-অতীতের আন্দোলন সম্পর্কে, তার ভূমিকা সম্পর্কে নিস্পৃহ। সতর্ক। অন্তত প্রকাশ্যে।

''আমি তো কখনও কমিটির নেতা ছিলাম না। মিটিং-মিছিলেও বেশি যাইনি। নিজের চোখ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম''—বললেন তিনি। মাওবাদীদের রাজনীতি আর কার্যকলাপ নিয়েও মুখ খুলতে চান না। ''আমি মাওবাদী বলে আলাদা করে কী করে চিনব? ওদের কি চারটা হাত চারটা পা আছে?''—ঝাঁঝিয়ে ওঠেন। জনসাধারণের কমিটি, মাওবাদী নেতৃত্ব বা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নাগরিক সংগঠনগুলির দাবিগুলি সম্পর্কেও প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি একইরকম সতর্ক, নিস্পৃহ। ''আমি কী করে বলব? সরকার যৌথবাহিনী এনেছে। সরকারই ঠিক করবে বাহিনী তুলে নেওয়া উচিত কিনা।'' ছত্রধর (মাহাত) -দের জেল থেকে ছাড়া ''উচিত কিনা, সেটা নিয়েও আমি কী বলতে পারি। আমি নিজের জ্বালায় মরছি।'' পাশ থেকে তাঁর স্বামী গোরাচাঁদ মৃদু স্বরে বলে ওঠেন— ''ছেড়ে দিলে তো ভালই হয়।'' ছিতামণি ভাবলেশহীন। পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য— ''আগের তুলনায় শান্তি ফিরেছে। যৌথবাহিনী প্রায়ই গ্রামে টহল দিতে আসে। হ্যাঁ, আগের মতো আমাদের মারধোর করে না। গাঁয়ের ছেলেরা অনেকে ঘরে ফিরেছে। অনেকে ফেরেনি।''

ছিতামণি মহাশ্বেতাদির গল্পের দোপদী মেঝেন নয়। তিনি তা হতে পারতেন কিনা তা আমি জানিনা। সময়টাও বদলেছে। কিন্তু আমি এই সাদামাটা চেহারার মধ্যবয়সিনী সাঁওতাল মায়ের সতর্কতার কারণ কিছুটা বুঝতে পারি যখন তার ছোট ছেলে পুলিন কথা বলে ওঠে। মায়ের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও।

কিশোর পুলিন ইতিমধ্যে ৯০ দিন পুলিশ ও জেল হাজতে কাটিয়ে ফিরেছে। এই বছর সম্ভত সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। জামিনে মুক্ত হলেও তার উপর লালগড় পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণের মামলা ঝুলছে।

''আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। আমি পড়াশুনাটা করতে চাই। কিন্তু মামলাটা থেকে নিস্তার না পেলে পড়ায় মন বসানো মুস্কিল। মমতা ব্যানার্জী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এসে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলাগুলো তুলে নেবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি আমাদের ভুলে গেছেন।''—এক নিঃশ্বাসে বলে যায়। এই একবারই বিপন্ন মায়ের চোখ তুলে তাকালেন ছিতামণি।

সোনামুখীর লাঞ্ছিতা অপমানিতা মায়েরা এখনও সুবিচারের আশায়, ভয় থেকে মুক্তির অপেক্ষায়। গোপীবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়লেও গ্রামটি ঝাড়গ্রাম শহর থেকে বেশি দূরে নয়। জঙ্গলঘেরা গ্রামটির বাসিন্দাদের মনে ২০১০ সালের ৩০ জুনের ভোরের স্মৃতি বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের মতো ফিরে ফিরে আসে। মাওবাদীদের খোঁজে হানা দিয়েছিল যৌথবাহিনী। গুলি চলেছিল। গাঁয়ের অধিকাংশ পুরুষ মানুষ জঙ্গলে গা ঢাকা দিলেও তাদের বাড়ির মেয়েরা রেহাই পাননি। মারধোর, লুটপাট শুধু নয়, তাদের কয়েকজন ধর্ষিতাও হন বলে অভিযোগ। ধর্ষণের সেই অভিযোগ নিয়ে যথাযথ ও নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন সেদিনের বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পরিবর্তনের একবছর পরেও সেই আশ্বাস কার্যকর না হওয়ায় ক্ষুব্ধ, হতাশ সোনামুখীর মানুষ। শুধু তাই নয়, তারা বিপন্ন, বিধ্বস্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিহিংসার সামনে। বাম আমলে সরকার ধর্ষণের অভিযোগ উড়িয়েই ক্ষান্তি দেয়নি। উল্টে যৌথবাহিনীর অভিযানের দিনই সোনামুখীর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মাওবাদীদের মদত দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। খুনের চেষ্টা, ষড়যন্ত্র, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, দেশদ্রোহিতা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন ধর্ষিতা মহিলারাও। সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের সুরাহা হয়নি বটে। কিন্তু নিষিদ্ধ মাওবাদীদের সঙ্গে সংসর্গের দায়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা আজও বহাল। আপাতত আগাম জামিন পেলেও গ্রেফতারি, হাজতবাস আর সম্পত্তি ক্রোকের আতঙ্কে গ্রামের মানুষের চোখে ঘুম নেই। এক অত্যাচারের শিকারদের উপর এভাবেই নেমে এসেছে আর এক অত্যাচার। আর সময়ের সার্কাসের নিদারুণ ভাঁড়ামো এমনই যে রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকারও আদালতে বিগত জমানার পুলিশি বয়ানেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। এহেন অবস্থায় আছেন কেমন সোনামুখীর মানুষ?

কলাবনি, দিঘিহার শাল-মহুলের জঙ্গল পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে খোঁজখবর শুরু করতে সন্দিগ্ধ চোখে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন

উপস্থিত নারী-পুরুষ। কিছুক্ষণ পর দ্বিধাগ্রস্থ পায়ে এগিয়ে এলেন এক যুবক। জানালেন, ছোটপেলিয়ার মতো এ গাঁয়েও মর্মান্তিক কাণ্ডের পর মিডিয়া এবং নেতা-নেত্রীদের ঢল নেমেছিল। সুবিচারের আশায় বারংবার নিজেদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী জানিয়েও লাভ হয়নি। ''আমরা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। কী হবে আর আপনাদের শুনিয়ে? আবার কী নতুন বিপদ হবে কে জানে?'' স্কুলের প্যারা-টিচার, বাংলার স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী দীপক মাহাত-র এ কথায় সায় দিয়ে এগিয়ে এলেন আরও কয়েক জন নারী-পুরুষ। তবু অনাহূত অতিথিদের বসতে দিলেন তারা। কথা বলতে বলতে একসময় খুললেন মনের আগল। তাদের মধ্যে কয়েকজন লাঞ্ছিত, ধর্ষিত মহিলাও। নির্বাচন-পূর্ব প্রচার-পর্বে লাঞ্ছিতা মহিলাদের দলীয় জনসভাতেও প্রদর্শন-বস্তুর মতো হাজির করেছিল তৃণমূল ভোট কুড়োতে। একথা জানালেন ওদের পরিবার-পরিজনরাই। কিন্তু আমরা এখানে তাদের নাম, পরিচয় প্রকাশ করছি না প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা মেনেই।

ঘটনা হচ্ছে আজ গ্রামের উপরপাড়ার বাসিন্দা এক মধ্যবয়সিনীই ধর্ষণের কথা প্রকাশ্যে বলেন। বাকি মহিলারা অত্যাচার, লাঞ্ছনার বর্ণনা দিলেও ধর্ষণ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। লোকলজ্জায় হোক অথবা সুবিচারের আশা সুদূর পরাহত হয়ে ওঠায়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সামনে বসে ধর্ষিতা মায়ের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠা শেষ বিকেলে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল। কেন দুঃসহ যন্ত্রণার স্মৃতি খুঁচিয়ে তুললাম? তা কি শুধু সাংবাদিকসুলভ ভুক্তভোগী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান পেতে? নাকি অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করার চেষ্টায়? আমার মাকে কি কখনও আমি এমন ভয়ংকর দুঃখস্মৃতি পুনবর্ণনের লাঞ্ছনায় ঠেলে দিতে পারতাম? নিজেকে এসব প্রশ্ন করতে করতেই শুনছিলাম তার কান্না-মাখা বর্ণনা। যা থেকে স্পষ্ট, মাওবাদী খোঁজার ছলে হিন্দিভাষী কোনও এক মদ্যপ জওয়ান বন্দুকের মুখে তাকে ধর্ষণ করেছিল। আরও কয়েকজন মহিলাকেও নিশানা করেছিল সেই জওয়ান। কিন্তু ধর্ষিতা মধ্যবয়সিনী চিৎকার করে তাদের সাবধান করে দেন। গ্রামের নিচপাড়ার বাসিন্দা এক মহিলা জানালেন, তাদের বাড়িতে দুদিক থেকে ঢুকে পড়েছিল যৌথবাহিনী। বাড়ির পুরুষমানুষরা তার আগেই পালিয়ে ছিলেন। ঘরে ছিলেন তিনি আর তার জা। সঙ্গে বাচ্চারা। মাটির দোতলা বাড়ির দুই তলায় দুই দল জওয়ানের তল্লাসি পর্বে গুলি চলে। গৃহবধূটির মন্তব্য— ভোরের আধো অন্ধকারে মাওবাদী সন্দেহে নিজেদের বাহিনীর উপরই গুলি চালায় তাদের সঙ্গীরা। গুলিতে এক পুলিশকর্মী আহত হওয়ার পরই উন্মত্ত হয়ে ওঠেন জওয়ানরা। বলে ''ওরা আমাদের বলে, আমরাই মাওবাদীদের লুকিয়ে রেখেছি ঘরে। মাওবাদীদের গুলিতে ওরা জখম হয়েছে। মারতে মারতে ওরা আমাকে আর আমার জা-কে মাঠে টেনে নিয়ে যায়। বাধা দিতে এসে বাচ্চারাও বেধড়ক মার খায়। বারবার ওরা বলছিল, আমাদের মেরে ফেলবে।'' গৃহবধূটির কাছে আমাদের সঙ্গী মহিলা ধর্ষণের কথা জানতে চাইলে কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন, ''অত্যাচারে আমি জ্ঞান হারাই। ঠিক কী ঘটেছিল মনে রাখার মতো অবস্থায় ছিলাম না।'' তার জা-র সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। আরও দুজন মহিলা ধর্ষিতা হন বলে দীপক জানান। তাদের সঙ্গেও আমরা কথা বলতে পারিনি। তবে তাদের অপরাপর কয়েকজন প্রতিবেশিনী জানালেন— ক্ষিপ্ত যৌথবাহিনী কীভাবে তাদের ঘরবাড়িতে চড়াও হয়, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। বাধা দিতে গিয়ে মেয়েরা-মায়েরা নিগৃহীত হন। কারও কারও আঘাত ছিল গুরুতর। এ ঘটনা সম্পর্কে বাম আমলের পুলিশি বয়ানে অবশ্য নারী নির্যাতন, ধর্ষণের উল্লেখ নেই। ঝাড়গ্রাম থানায় (কেস নম্বর ১৯৪/১০/জিডি ৪৮৩/১০) দায়ের পুলিশি অভিযোগ পত্রে বরং বলা হয়েছে ঃ মাওবাদীদের খোঁজে তল্লাসিতে বাধা দেন গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা। যৌথবাহিনীর জওয়ানদের উপর চড়াও হয়েই তারা ক্ষান্ত হননি। বাহিনী অবিলম্বে ফিরে না গেলে মিডিয়াকে ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ তুলে জওয়ানদের ফাঁসাবেন বলে শাসান গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা। আর তাদের নেতৃত্ব দেন সেই মহিলারা যারা ধর্ষণ লাঞ্ছনার অভিযোগ তুলেছেন। এফআইআর-এ যে ১৭ জনের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে সাতজনই সোনামুখীর ওই মহিলারা। এবং তাদের পরিবার তথা স্বামী-পুত্ররাও অভিযুক্ত। পাশের গ্রাম বিরিহাণ্ডির আর এক মহিলার নামও রয়েছে। অভিযুক্তদের তালিকার এক নম্বরে আছে জনসাধারণের কমিটির তৎকালীন সভাপতি উমাকান্ত মাহাত-র নাম। উমাকান্ত এবং অসিত মাহাত-র মতো প্রথম সারির কমিটি নেতাদের খোঁজেই সেদিনের অভিযান বলে পুলিশ গ্রামবাসীদের জানিয়েছিল। লালমোহন টুডুর পর কমিটির সভাপতি হন উমাকান্ত। পরবর্তীকালে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস নাশকতা কাণ্ডের অন্যতন প্রধান অভিযুক্ত উমাকান্তের পরিণতি হয় লালমোহনবাবুর মতোই। নিজের গ্রামের অদূরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু ঘটে বলে সরকার দাবি করে। অসিত পরে ধরা পড়েন। জামিনে মুক্তির মতো আর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কমিটি নেতার মতো তিনিও বর্তমান শাসক দলের শিবিরে যোগ দিয়েছেন। ভয়ে অথবা ভক্তিতে।

কিন্তু সোনামুখীর মহিলাদের রাহুগ্রাস এখনও কাটেনি। ভোটের আগে তৃণমূল ও কংগ্রেসের স্থানীয় এবং সর্বভারতীয় নেতা-নেত্রীরাও এই গাঁয়ের মেয়েদের লাঞ্ছনার প্রতিকার করার আশ্বাস দিয়ে গেলেও জমানা বদলের পরেও সরকারি বয়ান বদলায় নি। উল্টে ধর্ষিতা মধ্যবয়সিনী এবং গুলি চলেছিল যাদের বাড়িতে সেই গৃহবধূ ও তার জা-সহ অন্যান্য

লাঞ্ছিতা মহিলাদের মাওবাদী তকমা দিয়েছে নতুন সরকার।

গতবছর মহাশ্বেতা দেবী, তরুণ সান্যাল সব কয়েকজন প্রবীণ বুদ্ধিজীবী কলকাতা হাইকোর্টে যৌথবাহিনী, তৎকালীন শাসক দল এবং উগ্রপন্থীদের গুণ্ডামির বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থবিষয়ক রিট পিটিশন দাখিল করেন (রিট পিটিশন নম্বর ২৩৩৩ ডবল্যু, ২০১১)। আদালতের নির্দেশে ডিসেম্বরে রাজ্যের মুখ্যসচিব সমর ঘোষ একটি হলফনামা দাখিল করেন। সেই হলফনামায় সোনামুখীর ঘটনা সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট রয়েছে। মুখ্যসচিবের বক্তব্যের সমর্থনে জেলা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের কর্তাদের রিপোর্টও এতে সন্নিবিষ্ট। স্থানাভাবে তার বিশদে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মোদ্দা কথাগুলি আগের সরকারের আমলের বয়ানের মতই। এতে বলা হয়েছে, পূর্ব পরিকল্পনা মতো ২০১০ সালের ৩০ জুন ভোর পাঁচটায় যৌথবাহিনী সোনামুখী গ্রাম ঘিরে ফেলে। আলো ফোটার অপেক্ষায় রত বাহিনী গ্রামের মেয়েদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বলে। কিন্তু মহিলারা তাদের ঘরে ঢুকতে বাধা দেন। এমনই এক বাড়িতে মেয়ে-বৌরা বাহিনীকে বিপথচালিত করতে জানান, ভিতরে কোন পুরুষ মানুষ নেই। মহিলাদের কথা বিশ্বাস করে পুলিশবাহিনী দোতলা বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই ঘাপটি মেরে থাকা মাওবাদীরা নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। গুলিতে ঝাড়গ্রাম থানার এক সাব-ইন্সপেক্টর এবং সিআরপিএফের কোবরা বাহিনীর এক জওয়ান আহত হন। তাদের সঙ্গীরা গুলিবৃষ্টি সত্ত্বেও তাদের বের করে আনতে সক্ষম হন। গুলিযুদ্ধ থামলে বাহিনী তল্লাসি শুরু করার সময় অভিযুক্ত তিন মহিলার যারা ধর্ষিতা বা লাঞ্ছিতা নেতৃত্বে ভালো সংখ্যক গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা বাহিনীকে ঘিরে ধরে। এবং তাদের সরকারি কাজে বাধা দেয়। শুধু তাই নয়, তারা 'শয়তানি অঙ্গভঙ্গি' করতে থাকেন। 'গালিগালাজ' ইত্যাদি চলতে থাকে। তল্লাসি আটকাতে এতটাই তারা 'বেপরোয়া' ছিলেন, বিশেষ রণজিৎ মাহাতোর বাড়িতে তল্লাসি পর্বে। ওই বাড়িতেই গুলি চলেছিল। ''শেষ পর্যন্ত বাহিনী যখন ওই বাড়িতে ঢুকতে সক্ষম হয়, তখন কোনও মাওবাদী কর্মীদের সেখানে পাওয়া যায়নি।'' কিন্তু মুখ্য সচিবের রিপোর্ট বলছে—''ওই মহিলারাই মাওবাদীদের পালাতে সাহায্য করেছেন।'' মাওবাদী গেরিলাদের উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ, রিপোর্টের সংযোজন: পুলিশ মাওবাদীদের ছোঁড়া গুলির খোল, ফৌজি ঢঙের উর্দি এবং মাওবাদী পোস্টার উদ্ধার করে।

গাঁয়ের মেয়েরা পরিকল্পনামাফিক ধর্ষণের অভিযোগ তুলবেন ইত্যাদি গত সরকারের আমলের পুলিশি বয়ান এবারে অনুপস্থিত। ঘটনা বর্ণনায় জাম্প কাট করে এবার মুখ্য সচিবের ব-কলমায় বলা হয়েছে সোনামুখীর কিছু ''মহিলা ঝাড়গ্রামের মহকুমা শাসকের কাছে ধর্ষণের অভিযোগ তুলেছিলেন''। রিপোর্ট জানাতে ভোলেনি: ''তাদের মধ্যে মাওবাদী মহিলারা ইতিমধ্যে পুলিশের ওপর হানার মামলায় এফআইআর-এ অভিযুক্ত তালিকায়''। মহকুমাশাসক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করেন এবং বোর্ড ওই মহিলাদের যথাবিহিত পরীক্ষা করেন। ''কিন্তু প্রথম পরীক্ষায় ধর্ষণের বা অন্য হিংসাত্মক আচরণের কারণে কোন আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।''

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি, চিকিৎসকদের পরীক্ষা ঘটনার ক'দিন পরে করা হয়েছিল। কিন্তু ঝাড়গ্রাম হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীরা জানাচ্ছেন, তৎকালীন হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিরা তাদের কাছে গোপনে স্বীকার করেন—''কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু সেটা বাইরে বললে বিরাট বিপদ।'' গ্রামবাসীদের বক্তব্য—নিয়মমাফিক মেডিক্যাল বোর্ড বসেছিল অনেক পরে। তাও গ্রামে গুলিচালনা নিয়ে ১৩ আগস্ট, ২০১০ সরকারি তদন্তের সময় তারা ধর্ষণকাণ্ড নিয়ে তদন্তের দাবি তোলার পরই। তার আগে পুলিশ ধর্ষণের অভিযোগ নিতেই চায়নি।

বর্তমান সরকারের মুখ্যসচিবের বয়ানে অবশ্য এসবের উল্লেখ নেই। বরং বলা হয়েছে, ''মাওবাদী এবং জনসাধারণের কমিটির অত্যাচারের ভয়েই গাঁয়ের লোক মিথ্যে বানানো অভিযোগ তুলছেন। মাওবাদী এবং কমিটির লোকেরাই ধর্ষণের মিথ্যা অভিযোগ করতে বাধ্য করছে। উদ্দেশ্য, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করা এবং যৌথবাহিনীকে হয়রানি।''

ধর্ষণ, লাঞ্ছনার অভিযোগ এভাবে উড়িয়ে দিলেও অন্যদিকে পুলিশের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে যৌথবাহিনীর উপর হামলার মামলায় তদন্ত চলছে এবং অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাসি জারি রয়েছে। মুখ্যসচিবের রিপোর্টে উল্লিখিত—''জামিন-অযোগ্য ওয়ারেন্ট কার্যকর করার উদ্দেশ্যেই এই তল্লাসি।''

গ্রামবাসীরা জানালেন, এই ওয়ারেন্টের জেরেই ভোটের পরও গ্রামে এসে পুলিশ শাসিয়ে যায়, আত্মসমর্পণ না করলে অভিযুক্ত মহিলা ও তাদের পরিবার-পরিজনকে ফেরার দেখিয়ে তাদের সম্পত্তি ক্রোকের ব্যাবস্থা করবে প্রশাসন। ধান বিক্রি করে আগাম জামিনের টাকা জোগাড় করেছেন সবাই মিলে, জানালেন এক অভিযুক্ত মহিলার স্বামী। ক্ষোভ উগরে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর দলের প্রতি। ''আমাদের গ্রামের বুথে ৮২৬ জন ভোটার। ৮২৬ জনই তৃণমূলকে ভোট দিই। মমতা আমাদের সুবিচার দেবেন এই আশায়। ভোটের আগে তৃণমূল আমাদের বৌ-মেয়েদের নিয়ে কত মিটিং-ই না করেছিল। কিন্তু ক্ষমতায় এসে মমতা আমাদের ভুলে গেছেন।''—বললেন কমলেশ মাহাত। গাঁয়ের ছেলেরা নিজেদের তৃণমূল সমর্থক বলে পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না।

"জনসাধারণ কমিটির নেতৃত্বে সব সিপিএম-বিরোধী একজোট হওয়ার আগে আমাদের গ্রাম তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত ছিল। হার্মাদরা সেকারণেই আমাদের গ্রামকে যৌথবাহিনীর টার্গেট করতে চেয়েছিল।"—দীপকের বক্তব্য।

তার কাছেই জানা গেল, তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছিলেন— সোনামুখীর মায়েরা সুবিচার পাবেন। হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। কিন্তু ওই সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি মহাশ্বেতা দেবীদের রিট পিটিশনটির উল্লেখ করেন মাত্র। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত ও দলীয় স্তরে এই মামলা থেকে তাঁদের দূরত্বের কথাও জানিয়ে দেন। "আমি এই মামলায় বাদি-বিবাদি কোনও পক্ষেই যুক্ত নই। আদালতের অপেক্ষায় থাকব। সোনামুখীর মানুষের বিরুদ্ধে মামলা বাম আমলের। তবে দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, নতুন সরকারের আমলে পুলিশ তাদের আর হয়রান করছে না।"

দীপক ও তার সহমর্মী গ্রামের কিছু যুবক অবশ্য এখনও ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে সুবিচারের আশা ছাড়েন নি। বাম আমলে থানায় ধর্ষণ ও লাঞ্ছনার অভিযোগ দায়ের করার সাহস পাননি পুলিশি প্রতিহিংসার ভয়ে। ভোটের আগে থানায় অভিযোগপত্র পাঠান ডাকযোগে। সম্প্রতি ঝাড়গ্রাম মহকুমা আদালতে একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। সহায়-সম্বলহীন জেদ নিয়ে লড়তে চাইছেন তারা। কিন্তু এই লড়াইতে পিছিয়ে পড়ার জন্য তৃণমূল শুধু নয়, জনসাধারণের কমিটির নেপথ্যে থাকা মাওবাদীদের সমালোচনাও করেছেন তারা। "পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হতেই আমরা আইনি লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু তৎকালীন কমিটি নেতৃত্ব মাওবাদী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে জানাল, এসবের কোন দরকার নেই। কারণ, মাওবাদীরা দেশের সংবিধান ও আইন মানে না।" জানালেন দীপক ও তাঁর সহযোগীরা। তারাই জানালেন, বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা এবং নকশালপন্থী গোষ্ঠী সোনামুখীর মহিলাদের অভিযোগ নিয়ে আইনি পদক্ষেপে উৎসাহী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা পিছিয়ে যান মাওবাদীদের চাপে। "মাওবাদীরা সোনামুখীর ঘটনার প্রতিবাদেই নারী ইজ্জত বাঁচাও কমিটি গড়ে তোলেন। সোনামুখী নিয়ে ওরা প্রচার করেছে অনেক। কিন্তু আমাদের মেয়েদের সুবিচার পাওয়ার লড়াই নিয়ে ওদের মাথাব্যথা ছিল না।" সোনামুখীর মানুষের এই অভিযোগের জবাবে মাওবাদী নেতৃত্বের বক্তব্য ছিল জরুরি। পাইনি। আশা করি, ভবিষ্যতে তারা জবাব দেবেন। সে জবাব হয়তো ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ নিয়ে পুরোন বিতর্ক উস্কে দেবে। তা দিক। কিন্তু তা যেন রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র উদ্ঘাটনের দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্পে সোনামুখীর নির্যাতিতা মায়েদের 'কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ'-এর পর্যায়ে নামিয়ে না আনে। তাহলে রাষ্ট্রের পরিচালকদের সঙ্গে ভোট-যুদ্ধে আম জনতাকে দাবার ঘুঁটি রূপে ব্যবহারকারী সংসদীয় দলগুলির সঙ্গে বিপ্লবীদের পার্থক্য থাকবে সামান্যই।

**শিরসি**

পট-পরিবর্তনের জেরে ভঙ্গবঙ্গের রং এখন সবুজ। কিন্তু জঙ্গলমহলের কিছু গ্রাম আজও লাল, আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, কালচে লাল। না, রাজনীতির রঙের কথা বলছি না। ঝাড়গ্রামের কিছু দূরে শিরসি, জিতুশোল, বোরিয়া, কইমা, টেনিয়াভাঙ্গা সহ বেশকিছু গ্রাম লৌহ-আকরিকের ধুলোয় মাখা। গ্রাম-লাগোয়া শাল-পলাশের জঙ্গল, চাষের ক্ষেত, মাঠঘাট, ঘরবাড়িতে বটেই, গাঁয়ের ইঁদারা বা পুকুরেও সেই ধুলোর আস্তরণ। মাঝে মধ্যেই তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা কালো ধোঁয়ার উদ্গীরণ। ঝুল জমে গাছপালায়। শ্বাসকষ্ট, পেটের গণ্ডগোল, টিবি, চামড়ায় প্রদাহ ইত্যাদি নানা রোগে ভোগে এলাকার মানুষজন। তার সঙ্গে জলকষ্ট। সরকারি টিউবওয়েল প্রায়ই খারাপ থাকায় পানীয় জলের জন্য ইঁদারাগুলিই ভরসা। লালমাটির দেশে এমনিতেই সেচের জল মেলা দুষ্কর। কিন্তু ভূগর্ভের জলস্তর এই অঞ্চলে আরও নেমে গিয়েছে, পুকুর শুকোচ্ছে বিশালাকায় পাম্প বসিয়ে বিপুল পরিমাণ জল টেনে নেওয়ায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এসবই ঘটছে এলাকার তিনটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানা এবং একটি সিমেন্ট কারখানার দৌলতে। জিতুশোল, মোহনপর ও গজাশিমূলের তিন স্পঞ্জ আয়রন কারখানার সঙ্গে বোরিয়ার অদূরে সিমেন্ট কারখানার মালিক সজ্জন পাটোয়ারি এবং তার ভাইয়েরা। ভাইদের কোম্পানি আলাদা হলেও পাটোয়ারি পরিবারকেই মালিক হিসেবে দেখে এলাকার মানুষ। দূষণের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি জিতুশোলের কারখানার বিরুদ্ধে। যার মালিক সজ্জন পাটোয়ারি।

পাটোয়ারিদের বিরুদ্ধে দূষণবিরোধী আন্দোলনের শুরু পুলিশ এবং সিপিএম-বিরোধী জঙ্গলমহল আন্দোলনের অনেক আগেই। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে এই আন্দোলনে সিপিআইএমএল-এর নানা গোষ্ঠী এবং নাগরিক মঞ্চের মতো সংগঠন সামিল হয়েছেন বিভিন্ন পর্বে। ২০০৩-০৪ থেকে আন্দোলন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই এগিয়েছে ধরণা, অনশন, সমাবেশ, ডেপুটেশন, মিছিল, অবরোধ— কিছুই বাদ যায়নি। এমন একটি আন্দোলন ২০০৮-১০ পর্বে প্রশাসনের চোখে মাওবাদী নাশকতার ছক হয়ে উঠল। সেসময় বেলপাহাড়ি, লালগড় পেরিয়ে জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বে জঙ্গলমহল আন্দোলনের ঢেউ দূষণ-জর্জরিত গ্রামগুলোতেও পৌঁছেছে। মাওবাদীদের নেতৃত্বে কমিটির সংগঠন ছড়িয়ে পড়ে এসব গাঁয়েও। স্থানীয় মানুষের কথায়, কমিটিও দূষণবিরোধী পোস্টার দেয়, কিন্তু ২০০৯ সালের জুনে যৌথবাহিনী নামার পর পরিস্থিতি দ্রুত বদলায়। পাটোয়ারিদের সঙ্গে প্রশাসন ও

যৌথবাহিনীর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। দূষণবিরোধী আন্দোলনের উপর দমনপীড়ন বাড়ে। ''আমরা অনশনে বসলেও পুলিশ পিটিয়ে তুলে দিত। বলতো, তোরা সব মাওবাদীদের চেলা। যৌথ-বাহিনী পাটোয়ারিদের (আকরিক ভর্তি) ট্রাক পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত। কারখানার কাছেই থাকত বাহিনী।''—জানালেন শিরসির রতন মাহাত।

আমরা গাঁয়ে ঢুকতে প্রাথমিক শঙ্কা, সন্দেহ কাটিয়ে একে একে জড়ো হচ্ছিলেন বিভিন্ন পরিবারের মানুষ। তারাই জানালেন, ২০০৯ সালের ২০ ডিসেম্বর এই শিরসি গ্রামের দুই যুবক, সতীশ মাহাত ও কাজল মাহাত যৌথবাহিনীর গুলিতে মারা যান। অপর একজন নিহতের নাম সন্তু মাহাত। পাশের গ্রাম কইমার বাসিন্দা।

তার দুদিন আগেই জিতুশোলের স্পঞ্জ কারখানায় আগুন লাগানো হয়। কিছু গাড়ি পুড়ে যায়। প্রশাসন ও কারখানার কর্তৃপক্ষ এটা মাওবাদীদের কাজ বলেই মনে করেন। পাটোয়ারিদের কারখানা ও তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এলাকায় টহল বাড়ায় যৌথবাহিনী। শিরসির পাশেই ঘন জঙ্গল। সেখানে মাওবাদী স্কোয়াডের ঘাঁটি। আশেপাশের সবকটি গাঁয়েই স্কোয়াডের আনা গোনা। রাতবিরেতে সভা, দিনমানে মিছিল। গাঁয়ের নারী-পুরুষদের তারা যৌথবাহিনীকে প্রতিরোধের ডাক দেয়। এভাবেই গুলিযুদ্ধের পটভূমি রচিত হয়। কী হয়েছিল সেদিন? ''বোরিয়ার কাছে সিমেন্ট কারখানার পথে বড় রাস্তায় যৌথবাহিনী মাইন পেয়েছে বলে এলাকায় তল্লাসি শুরু করেছিল। বোরিয়ায় ঢুকে লোকজনকে পেটাচ্ছে শুনে আমরা ছুটে যাই আমাদের গাঁয়ে ঢোকার পথ আটকাতে। গাঁয়ে ঢুকলে তল্লাসির নামে মারধোর, লুটপাট, ধরপাকড় চলবে জানতাম। তাই আমরা পথ আটকাতে যাই। হঠাৎ গুলি চলল। কামানের গোলা ছুঁড়ছিল যৌথবাহিনী। ভিড়ের মধ্যে আমার পাশেই ছিল সতীশ। গুলি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।''—গাঁয়ের গৃহবধূ বালিকা মাহাত জানালেন।

গাঁয়ের মানুষ যাকে 'কামানের গোলা' বলছেন, সরকারি রিপোর্ট তাকে মর্টার থেকে ছোঁড়া 'হাই এক্সপ্লোসিভ বম্ব' বলে স্বীকার করা হয়েছে। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে হাইকোর্টে দাখিল মুখ্যসচিবের হলফনামা মোতাবেক, মর্টার থেকে সিআরপি এফ দুই রাউন্ড ওই বোমা ছোঁড়ে। এছাড়া ইনসাস রাইফেল থেকে ৮০ রাউন্ড এবং এ-কে ৪৭ রাইফেল থেকে ২১ রাউন্ড গুলি ছোঁড়া হয়। সচরাচর যুদ্ধক্ষেত্রে এসব ব্যবহৃত হয়। কী কারণে এমন ভয়ংকর গোলা-গুলির প্রয়োজন পড়েছিল? রিপোর্ট বলছে— গোপন সূত্রে খবর মেলে মাওবাদী নেতা বিকাশের নেতৃত্বে ৪০-৫০ জনের একটি সশস্ত্র দল আগ্নেয়াস্ত্র এবং ল্যান্ড মাইনে সজ্জিত হয়ে বোরিয়া গ্রামের অদূরে জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে আছে। তাদের উদ্দেশ্য, পার্শ্ববর্তী ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক এবং নয় নম্বর রাজ্য সড়কে চলমান গাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং সেখানে মোতায়েন বাহিনীর উপর আক্রমণ, পুলিশের গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে অস্ত্র লুটপাটের পরিকল্পনা। খবর পেয়ে বেলা দুটো নাগাদ বোরিয়া পৌঁছোয় বাহিনী। জানা যায়, মাওবাদীরা শিরসির লাগোয়া খালের কাছে। বাহিনী সেদিকে এগোতেই জঙ্গল থেকে গুলি-বোমা ছুঁড়তে থাকে মাওবাদীরা। আত্মরক্ষার্থে বাহিনীও পাল্টা গুলিগোলা চালায়। যুদ্ধ থামলে তল্লাসি চালানোর সময় জঙ্গলে গুলিবিদ্ধ একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে জওয়ানরা। পুলিশ একটি দু-নলা বন্দুক উদ্ধার করে, সঙ্গে দুই রাউন্ড কার্তুজ। জিতুশোলের বাসিন্দা সঞ্জিত মাহাতোকে কয়েক রাউন্ড গুলি ও একটি ওয়ান শটার আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা হয়। এছাড়া মাইন সন্দেহে একটি স্টিলের কৌটো, তার, জিলেটিন স্টিক, মাওবাদী পোস্টার ইত্যাদিও উদ্ধার হয়। পুলিশ বাহিনীর কেউ কেউ আঘাত পেলেও রিপোর্টে তাদের কারও গুলিবিদ্ধ হওয়ার উল্লেখ নেই।

হাসপাতালে নিহত গ্রামবাসীর পরিচয় জানা যায় তিনি শিরসির বাসিন্দা সতীশ মাহাত। পরে সন্তু মাহাতর মৃতদেহও উদ্ধারের উল্লেখ করলেও রিপোর্টে কাজল মাহাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার মৃত্যু সম্পর্কে থানায় কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। মৃতদের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে : 'স্প্রিনটার জাতীয় ছুটন্ত বস্তুর অতর্কিত আঘাতের জেরে 'শক ও রক্তক্ষরণে' মৃত্যু ঘটেছে। গুলি নয়, মর্টারের থেকে ছোঁড়া বোমার 'স্প্রিনটার'-এর আঘাতে মৃত্যুর দিকেই ইঙ্গিত। সতীশ ও সন্তু দুজনকেই সিপিআই(মাওবাদী)র সক্রিয় কর্মী এবং যৌথবাহিনীর উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে জমায়েতে যুক্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সরকার-বদলের পর তৈরি এবং দাখিল মুখ্যসচিবের হলফনামা এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশি নথিপত্রে কোথাও শিরসি-সহ আশেপাশের গাঁয়ের মানুষের দূষণবিরোধী আন্দোলনের কথা নেই। নেই জিতুশোল কারখানায় অগ্নিসংযোগ প্রসঙ্গ অথবা সিআরপিএফ-কে আটকাতে গায়ের নারী-পুরুষের জমায়েতের কথা। যে গুলিযুদ্ধে মর্টার, ইনসাস ইত্যাদি ব্যবহার করতে হল সেখানে মাওবাদীদের থেকে দো-নলা বন্দুক আর 'সিঙ্গল শর্টার'-এর চেয়ে বেশি আধুনিক মারণাস্ত্র উদ্ধার হল না? এহেন যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের আগে নিয়মমাফিক গাঁয়ের নারী-পুরুষকে সতর্ক করা হয়েছিল বা সরে যেতে বলা হয়েছিল কী? —এসব কোনও প্রশ্নের উত্তর হলফনামায় নেই। সতীশ মাহাতর স্ত্রী সুখী মাহাত অবশ্য জানালেন, তার স্বামী সাতে-পাঁচে থাকতেন না। জঙ্গলের কাছে নিজেদের খেতের কাজ দেখছিলেন। গাঁয়ের মানুষের জমায়েত দেখে এগিয়ে যান। নিহতদের পরিবারগুলির সঙ্গে প্রশাসন বা তৎকালীন

শাসকদলের কেউ যোগাযোগ করেনি। বর্তমান শাসকদলের স্থানীয় নেতারা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেন ক্ষমতায় এলে তারা দেখবেন, গুলি চালনা নিয়ে যাতে তদন্ত হয়। নিহতদের পরিবার কিছু সরকারি সাহায্য পায় নি।

উল্লেখ্য, হাইকোর্টের কাছে দাখিল রিপোর্টে বর্তমান সরকার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের বিশেষ স্কিম অনুসারে মাওবাদীদের হাতে নিহত অসামরিক ব্যক্তিদের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা এক্স-গ্রাসিয়া বাবদ দেওয়া হচ্ছে। এরকম ৭৮ জন নিহত ব্যক্তির তালিকা দাখিল করে বলা হয়েছে সব মিলিয়ে ৮১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। (গভর্নমেন্ট অর্ডার নম্বর ১৮৬৫-এস ই এমসি/এইচপি/বিএমসি/এসআরই, ৮ ডিসেম্বর, ২০১১) নিহতদের দুজন বাদে বাকিরা সকলে পশ্চিম মেদিনীপুরের মানুষ। এরকম আরও দুটি তালিকায় ৪৮ জন এবং ২৬ জন নিহতের নাম রয়েছে। সব মিলিয়ে মাওবাদীদের হাতে খুন কত জনের পরিবারই এই সরকারি অনুদান পাবেন বা ইতিমধ্যে কতজন পেয়েছেন তার ছবিটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু সরকারি নীতিটি স্পষ্ট। মাওবাদী হানায় নিহতদের পরিজনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও রিপোর্টে ''হার্মাদ বাহিনী ও যৌথবাহিনীর হাতে নিহত গ্রামবাসীদের অনুদান প্রসঙ্গে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি। যদিও মহাশ্বেতা দেবীদের রিট আবেদনে ''উগ্রপন্থী ও যৌথবাহিনীর সঙ্গে শাসকদলের হাতে নিহতদের পরিবারগুলিকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, রিলিফ এবং পুনর্বাসনের'' কথা বলা হয়। তাদের আবেদনক্রমে হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্প এবং কার্যকর পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু জাতীয় বা রাজ্য স্তরে সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত সাধারণ নাগরিকদের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। যদিও ভোটের আগে মাওবাদীদের সঙ্গে গলা মিলিয়েই তিনি জঙ্গলমহলে 'হার্মাদ' ও যৌথবাহিনীর অত্যাচারের অভিযোগ তুলতেন।

কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী মোকাবিলার নামে সরকারি বাহিনীর দ্বারা সাধারণ নিরীহ নাগরিকদের হত্যা, গুম-খুন নিয়ে অভিযোগ বারংবার উঠেছে। কিছু ক্ষেত্রে তা সরকারি তদন্তেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দোষীদের যথোপযুক্ত শাস্তি এবং নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন সংক্রান্ত কোনও জাতীয় নীতি আজও ঘোষিত হয়নি। সাম্প্রতিক মণিপুর নির্বাচনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর্মি স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট বাতিলের দাবিতে অনশনরত ইরোম শর্মিলা চানুর সঙ্গে দেখা করেন। জনসভায় মণিপুরী জনমতের প্রতিধ্বনি তুলে এই কালাকানুনের সমালোচনা করেন। কিন্তু নিজের খাসতালুকে উর্দিধারী বাহিনীর হাতে নিহত বা অত্যাচারিতদের ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করছেন। এই প্রশ্নে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার ও তাঁর অবস্থান একই। মুখ্যসচিবের হলফনামাতেই তার প্রমাণ স্পষ্ট।

শিরসির মানুষের কাছে এখন ক্ষতিপূরণের চেয়েও আশু দাবি : দূষণ সমস্যার সমাধান। ''আমরা তো সবাই তৃণমূলকেই ভোট দিয়েছি বিধানসভায়। দূষণ আমাদের রুটি-রুজি, স্বাস্থ্য সবকিছুতেই থাবা বসিয়েছে। আশায় ছিলাম, নতুন সরকার এলে সমস্যার সুরাহা হবে। কিন্তু হচ্ছে কই!'' —আক্ষেপ গুরুচরণ মাহাতর। ''এখন তো আমরা প্রতিবাদ করতেই ভয় পাচ্ছি। ফের হয়তো মাওবাদী বলে তুলে নিয়ে ইউএপিএ আইনে জেলে ভরে দেবে।'' —বললেন তিনি। নিহত কাজল মাহাতর স্ত্রী প্রতিমা গাঁয়ের মেয়েদের বিশেষ সমস্যার কথা জানালেন। ''কারখানার ধোঁয়া আর লোহাচুর ধুলোয় শাল-পাতাও কালো হয়ে যাচ্ছে। সেই শালপাতা তুলতে গেলে আমাদের চামড়ার জ্বলুনি। শালপাতা না কুড়োলে আমরা খাব কী? ওই পাতা সেলাই করে প্লেট বানিয়েই তো আমাদের সংসার চলে।'' টেনিয়াভাঙ্গার কনকলতা মাহাত বা কইমার প্রভাবতী মাহাতরাও তার সুরে সুর মেলালেন। ''আগে গরীব মানুষ ঘরের চালে বেড়ে ওঠা লাউডগা, কুমড়ো ডগা খেয়ে বাঁচত। এখন লোহাচুরের আস্তরণ পড়ে তাও খাওয়ার অযোগ্য'' —বললেন কনকলতা। স্থানীয় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের রেকর্ড মোতাবেক ২০১০-১১ সালে আশেপাশের গ্রামগুলিতে গোটা কুড়ি টিবি রোগী মিলেছে। এদের বেশ কয়েকজন জিতুশোলের।

জিতুশোল স্পঞ্জ আয়রন কারখানা আর বোরিয়ার সিমেন্ট কারখানার মালিকানা সজ্জন পাটোয়ারির রেশমি সিমেন্ট ইন্ড্রাস্ট্রিজের। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার শুভেন্দু বিশ্বাস অবশ্য দূষণের অভিযোগকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মনে করেন। তবে তিনি স্বীকার করলেন, বছর কয়েক আগে সরকারি সংস্থা, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ মাত্রাতিরিক্ত দূষণের দায়ে জিতুশোলের কারখানাটি বন্ধ করে দেন। ''তারপর তো আমরা ইলেকট্রোস্টাটিক প্রেসিপিটেটর-এর ক্ষমতা দ্বিগুণ বাড়িয়েছি লৌহ-আকরিক চূর্ণ বাতাসে যাতে কম মেশে। এখন তো তা ন্যূনতম মাত্রায়। কারখানার চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া যাতে না বেরোয় তারজন্য স্বয়ংক্রিয় এবং অত্যাধুনিক নজরদারি ব্যবস্থাও আছে। কুলিং-এর প্রয়োজনে ভূগর্ভের জল ব্যবহারও অনেক কম হচ্ছে। কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নির্গত তাপকে আমরা নিজেদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগাচ্ছি। বর্ষায় জল ধরে রাখার ব্যবস্থাও হয়েছে।'' — জানালেন তিনি।

তার কথায়, ''এখন তো শান্তিতেই কারখানা চলছে। তবে পাবলিকের মুড কখন কী হয় বলা যায় না। উস্কোনোর লোকের তো অভাব নেই।'' আপাতত কারখানা কর্তৃপক্ষ শান্তিতে থাকলেও দূষণবিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি সরকারি

প্রতিহিংসার মনোভাব নতুন জমানাতেও বহাল। জিতুশোল কারখানায় মাওবাদীরাই আগুন লাগায় বলে বিশ্বাসবাবু মনে করলেও দূষণবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা উপাংশু মাহাতকে চারমাস জেলবন্দী থাকতে হয়েছে। উপাংশু সিপিআইএমএল সন্তোষ রাণা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। নাগরিক মঞ্চের কনভেনর নব দত্ত নাগরিক সমাজের আন্দোলনে পরিচিত নাম। নানা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং রুগ্ন ও বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগঠনের সূত্রেই পরিবেশবন্ধু জনমত গঠনে তিনি সক্রিয়। নববাবু জানান, বিগত সরকারের আমলেই জিতুশোলে কারখানায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। আর নির্বাচনের পর নতুন সরকারের আমলে দাখিল পুলিশি চার্জশিটে তাঁকে ওই মামলায় 'প্রধান ষড়যন্ত্রী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর ষড়যন্ত্রের নমুনা হিসেবে উল্লেখিত ১৬ ডিসেম্বর (আগুন লাগার দুদিন আগে), ২০০৯ সালে কলকাতার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সামনে স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির মাত্রাছাড়া দূষণের মোকাবিলায় সরকারি গয়ংগচ্ছ মনোভাবের প্রতিবাদে আয়োজিত জমায়েতকে দেখানো হয়েছে। ওই জমায়েতের অন্যতম সংগঠক ছিল ঝাড়গ্রামের কমিটি এবং নাগরিক মঞ্চ। এর আগে আগস্টে পর্ষদের গ্রিন ট্রাইবুন্যাল বিচারপতি গীতেশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দূষণ বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত জিতুশোলের কারখানা বন্ধের নির্দেশ দেয়। কিন্তু অদৃশ্য কলকাঠি নেড়ে সেই নির্দেশ বাতিল করা হয়। বিক্ষোভ জমায়েতে তার প্রতিবাদ করা হয়।

স্থানীয় মানুষের বক্তব্যে স্পষ্ট, গ্রামে গ্রামে দূষণ সমস্যা আজও রয়েছে। আর তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক, আইনানুগ আন্দোলনে নেমে পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীদের মাওবাদী তকমা দিয়ে কারাবন্দী করার ব্যবস্থা চলেছে পরিবর্তিত জমানাতেও। ''আমরা তো সমস্ত সাংসদ, মন্ত্রীদের চিঠি লিখে দূষণ সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রীর কাছেও আমাদের একটাই বক্তব্য : রাজ্যের পরিবেশ দফতর স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির জন্য যে দূষণ-নিয়ন্ত্রক গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে, সেটা রাজ্যের কমবেশি ১১০টি স্পঞ্জ আয়রন কারখানাকে মেনে চলতে বাধ্য করা হোক।'' —নববাবু জানালেন। কিন্তু তাঁর আক্ষেপ, বর্তমানে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি নজরদারি ব্যবস্থাটাই কার্যত ভেঙ্গে পড়েছে। আর উপাংশুবাবুর মন্তব্য : ''এখন তো পাটোয়ারিদেরই সরকার।'' দুজনেই দূষণ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মাওবাদীদের সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন, বরং জন-সাধারণের কমিটির পর্বে মাওবাদীদের সঙ্গে দূষণবিরোধী কমিটির নানা টানাপোড়েনের উল্লেখ করেছেন তাঁরা। কিন্তু মাওবাদী নেতৃত্বের বক্তব্য না জানায় আমরা এখানে সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃবৃন্দ তথা বিধায়করা দূষণ-সমস্যার কথা অস্বীকার করেননি। কিন্তু তার তীব্রতা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছেন প্রাক্তন নকশালপন্থী নেতা চূড়ামণি মাহাতো যিনি এখন তৃণমূলের টিকিটে ভোটে জিতে গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক। একদা জিতুশোল-গজাশিমূল-মোহনপুরের স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও তিনি সামিল হয়েছিলেন। এখন তিনি ওই সব কারখানায় শ্রমিক সংগঠনের নেতা। তাঁর কথায়, ''কারখানা হলে কিছুটা দূষণ তো হবেই। এখানে দূষণসমস্যা নেই এটা বলছি না। তবে অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার জোরে তার মাত্রা এখন অনেক কম।'' তাছাড়া, তিনি দাবি করলেন, এলাকার যেসব মানুষ ওইসব কারখানায় চাকরি পেয়েছেন, তারা আর দূষণ নিয়ে মাথা ঘামান না। ''যারা চাকরিবাকরি বা অন্য সুযোগসুবিধা পায়নি তারাই এ নিয়ে অভিযোগ করছে। খোঁজ নিয়ে দেখব।'' স্পষ্টতই, সমস্যার তীব্রতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান। তার একদা কমরেড এবং বর্তমান সমালোচকরা অবশ্য এর পিছনে অন্য কারণ শুনিয়েছেন। শ্রীকান্ত মাহাতো, শালবনির তৃণমূল বিধায়ক একদা নকশালপন্থী রাজনীতির ঘনিষ্ঠ এবং জনসাধারণের কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৃণমূলের টিকিটে ভোটে জেতার পর তিনি এখন রাজ্য বিধানসভার পরিবেশ, বন ও পর্যটন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি জানালেন, জিতুশোলের স্পঞ্জ আয়রন কারখানার দূষণ নিয়ে অভিযোগ তার কানে এসেছে। কিন্তু সতীর্থ চূড়ামণি তাকে জানিয়েছেন, সমস্যা এখন অনেক কম। ভবিষ্যতে তার ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন এলাকার স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলি পরিদর্শনের ইচ্ছা আছে। তবে ইতিমধ্যে তাঁর স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা বর্ধমান শিল্পাঞ্চল ও হলদিয়ার কিছু স্পঞ্জ কারখানায় ঘুরে এসেছেন। ''তাঁরা সেখানে ব্যাপক দূষণ সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছেন। স্থানীয়দের অভিযোগও শুনেছেন। আমরা ঠিক করেছি দূষণ নিয়ন্ত্রক যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করব।'' —জানালেন শ্রীকান্ত বাবু। কিন্তু শাসক দলের নেতা নেত্রীদের এধরনের ঘোষণা নতুন নয়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলেও বর্ধমানের সিটু সম্মেলনের রিপোর্টে স্পঞ্জ আয়রন কারখানাগুলির যথেচ্ছ দূষণ এবং স্থানীয় জনজীবন, পরিবেশ ও কৃষিতে তার মারাত্মক প্রভাব নিয়ে কড়া মন্তব্য করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু তাতে শিল্পায়নের স্বপ্নে বিভোর সরকারের বিশেষ হেলদোল যে হয়নি তা দূষণ অব্যাহত থাকাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়।

# পরিবর্তনের অন্য স্বর— একটি সামাজিক-রাজনৈতিক চালচিত্র

অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকারের একটি বছর অতিক্রান্ত হল। এই সময়টুকুর মধ্যেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি থেকে ক্রমাগত পেছু হটা এবং বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনাগুলি লক্ষণীয়। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের আত্মহত্যা। হাসপাতালে শিশু মৃত্যু, শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে মহিলাদের প্রতি হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়া এবং এই সমস্ত ঘটনাগুলির প্রতি চূড়ান্ত অমানবিক এবং দায়িত্বহীন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ— অনেক মানুষকেই নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। এই সঙ্গে চলছে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক বিক্ষোভজনিত আন্দোলনগুলির ওপর রাষ্ট্র ও শাসকদলের নির্বিচারে আক্রমণের ঘটনা।

লক্ষণগুলির সূত্রপাত দেখা যেতে শুরু করেছে বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতিকে প্রথমে সভা করার অনুমতি দিয়ে পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া, মহাশ্বেতা দেবী প্রতিবাদ করলে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া, বন্দীমুক্তির প্রশ্নটিকে আইনি জটিলতার মধ্যে ফেলে দিয়ে অযথা দীর্ঘায়িত ও বিলম্বিত করা, শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে নৈরাজ্যের বাতাবরণ তৈরি করা ইত্যাদি বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই বহু চর্চিত। বরঞ্চ অন্য কয়েকটি বিষয় আলাদা করে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

**২৮ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা**

শিল্প ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সরকারের এবং মিডিয়ার এক বৃহদংশের যে ভূমিকা লক্ষ্য করা গেল তা রীতিমতন অবাক করে দেবার মত। এই দুটি পক্ষই বিষয়টিকে চিত্রিত করতে চাইলেন যেন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সিপিএমের ডাকা একটি বাংলা বন্ধ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। এটা যে মূলত একটি শিল্প ধর্মঘট এবং তাও সর্বভারতীয় স্তরে ধর্মঘটের বর্শামুখ যে কেন্দ্রীয় সরকারের গত কয়েক বছরে অনুসৃত জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে— সেটাকে আড়াল করে এটিকে নিছক সিপিএম বনাম তৃণমূল জাতীয় সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে দেওয়া হল। উপরন্তু যারা সেদিন ধর্মঘটে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেও যানবাহনগত অসুবিধার কারণে কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারেন নি— তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসামূলক হিংস্র আচরণের যে প্রকাশ দেখা দিল তা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও অতটা দেখা যায় নি। বহুবছর বাদে এই শিল্পধর্মঘটের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে শাসক কংগ্রেসের অধীনস্থ ট্রেড ইউনিয়ন— এমনকি বিজেপি পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিও তাদের স্ব স্ব দলের ঘোষিতনীতির বিরুদ্ধে গিয়ে অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে একযোগে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল, আগামীদিনের শ্রমিক আন্দোলনে যা অনেক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে।

**কর্পোরেট মিডিয়া ও তৃণমূল সরকার**

এ মুহূর্তে প্রধানত দুটি বিষয় নিয়ে কর্পোরেট মিডিয়া অনেক বেশি ভাবিত। তার মধ্যে একটি হল ইন্‌ফোসিসের এ রাজ্যে বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারটি। বলা হচ্ছে:

> ইনফোসিসের বিনিয়োগ হইতে নতুন কর্মসংস্থান হইবে, শিক্ষিত বেকার অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গে যাহা মহামূল্যবান। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ খরায় আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গে ইনফোসিসের মতো সংস্থা লগ্নি করিলে সামগ্রিকভাবে বিনিয়োগকারীদের নিকট এই রাজ্যের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হইবে।...
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে ভাবিয়া দেখুন। সেজ তথা জমি অধিগ্রহণ সম্পর্কে তাহাদের ধারণা বা বিশ্বাসের যৌক্তিকতা কতটুকু?... সেজ সতত খারাপ কিংবা জমি অধিগ্রহণ কিছুতে চলিবে না— এই চরম অবস্থানই বা কোন যুক্তিতে গ্রহণীয়। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, সম্পাদকীয়, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২)

এখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অনেক জনমোহিনী পদক্ষেপের মধ্যে অবশেষে *সেজ* আইন বাতিল ঘোষণা করলেন। তার ফলে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী যে কতটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন তার প্রমাণ এই সম্পাদকীয়টি— 'জেদ বড়, না আস্থা?' (২৬ মে, ২০১২)

দ্বিতীয়টি হচ্ছে —সাম্প্রতিক কালে হিলারি ক্লিন্টনের সফর সংক্রান্ত বিষয়ে।

> ...হিলারি ক্লিন্টনের সফর বাহিত পশ্চিমবঙ্গে ফের সুযোগ আসিয়াছে... প্রশ্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাড়াইয়া দেওয়া হাতটি পশ্চিমবঙ্গ ধরিবে কি?... রাজ্যের স্বার্থে যদি দলীয় ইশ্‌তেহারটিকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা করাই বিধেয়। ...খুচরা ব্যবসায়ে বিদেশী বিনিয়োগ প্রসঙ্গে তাঁহার দলীয় ইশ্‌তেহার যাহাই বলুক না কেন, সেই কথা বিস্মৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (*আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৯ মে ২০১২)

একদিকে কর্পোরেট লবি-মিডিয়ার এই উপদেশামৃত, অন্যদিকে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর জনভিত্তিকে সুরক্ষিত ও প্রসারিত লক্ষ্যে বেশ কিছু জনমোহিনী পদক্ষেপ গ্রহণ করার মধ্যে শ্রেণীগত ভারসাম্য বজায় রাখার যে সূক্ষ্ম সীমারেখা রয়েছে— তা কতদিন বজায় রাখা সম্ভব হবে?

**জনপ্রিয়তাবাদ বা জনমোহিনীবাদের অস্ত্র**

এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে কেন্দ্র কর্তৃক পেশ করা সন্ত্রাস

বিরোধী আইনের বিরোধীতা, *সেজ* আইন বাতিল, আমরি কান্ডে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ যা ফিকির কর্তাদের অসন্তুষ্ট করে তুলেছে, এফডিআই বাতিল ঘোষণা, রেল বাজেটের ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে তার দিশামুখ খানিকটা হলেও পরিবর্তিত করা, কুখ্যাত সুশান্ত ঘোষ-লক্ষ্মণ শেঠের গ্রেপ্তার ও বিচার, ইমামদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদি গ্রহণ, প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পীদের সংবর্ধনাজ্ঞাপন, গুণীজনদের বঙ্গবিভূষণ সম্মাননা প্রদান করা, বাঙালীর দুই বড়ো আইকন রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের বিশাল জাঁকজমক করে সার্ধ-শতবর্ষ পালন— কিছুটা পরিমাণে হলেও বাঙালির আবেগ-অনুভূতি-জাতীয়তা-বাদকে এক ধরনের তরল মোহে চালিত করছে সন্দেহ নেই। উপরন্তু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শ উর্দ্ধে তুলে ধরে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টিকেও অন্য মাত্রায় তুলে নিয়ে যেতে চাইছেন। আশ্চর্যের বিষয়, যে কর্পোরেট মিডিয়া বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কিছু অর্থনৈতিক পলিসি সংক্রান্ত ব্যাপারে সমালোচনা মুখর, তারাই কিন্তু আবার এই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শকে উর্দ্ধে তুলে ধরার ব্যাপারে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। (দ্রষ্টব্য : *আনন্দবাজার পত্রিকা*, সম্পাদকীয়, ২৯ ফেব্রুয়ারি ও ১১ মে ২০১২)

**নাগরিক সমাজের ভূমিকা**

নাগরিক সমাজের একটি অংশ যারা প্রথমদিকে তৃণমূলের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন তারাও এক বছরের কার্যকলাপে ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন, এমন কি বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখর হচ্ছেন। অন্য একটি ক্ষুদ্র অংশ অবশ্য বরাবরই ছিলেন এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অবস্থানে। বামফ্রন্টের কুশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিলেও অন্যদিকে ঝুঁকে পড়তে চাননি। সাম্প্রতিককালে নোনাডাঙ্গার উচ্ছেদের ঘটনায় এবং সামগ্রিক-ভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে আবেদন সংক্রান্ত দুটি বিবৃতিতেও এই চিত্রটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে বর্তমান জমানায় কিছু প্রতিথযশা বুদ্ধিজীবী শিল্পী-সাহিত্যিক সরকারি পদ ও দাক্ষিণ্যের ওপর এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন যে তাদেরকে এই সরকারের যাবতীয় অন্যায় কার্যকলাপকে সমর্থন জানিয়ে পথে নামতে হচ্ছে। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ-প্রতিরোধের লক্ষণসমূহ বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। আজ থেকে প্রায় ছ'মাস আগে যখন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাওবাদীদের আখ্যা দিয়েছিলেন সুপারি কিলার হিসেবে এবং জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের দায়ও তাদের উপরই চাপিয়ে দিয়েছিলেন (নির্বাচনের আগে এই দুটি বিষয় সম্পর্কে তার দেওয়া বিবৃতি দুটি স্মরণ করুন) তখন থেকেই প্রতিবাদগুলি দানা বাঁধতে শুরু করেছে। পরবর্তীতে পার্কস্ট্রীট কান্ড-সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ও কার্টুন কাণ্ড প্রতিবাদগুলিকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করেছে।

**নোনাডাঙ্গা এবং তারপর**

কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে নোনাডাঙ্গা ও তার আশপাশের অঞ্চলে স্থানীয় মানুষজন ও বস্তিবাসীদের প্রতিরোধের ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্র প্রশাসন ও সরকার ব্যাপক দমনপীড়ন নামিয়ে এনেছে এর বিরুদ্ধে। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হচ্ছে নোনাডাঙ্গার ঘটনা একটি ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত নীতির অনিবার্য পরিণতি যা আগামীদিনেও ঘটতেই থাকবে। সম্প্রতি *ইকনমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি*-তে একটি প্রবন্ধে লেখিকা দেখিয়েছেন যে জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল রিনিউয়াল আরবান মিশন প্রকল্পটি যদি প্রকৃত অর্থেই বাস্তবায়িত করতে হয় তাহলে সরকার কর্তৃক অনুসৃত পথটিই একমাত্র পদ্ধতি। (ইপিডব্লু, ২৮ এপ্রিল, ২০১২)

তাছাড়াও অনেকদিন ধরে স্থির করা রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রকল্প, যেমন—

১) পূর্ব কলকাতার নোনাডাঙ্গায় বিজনেস পার্ক;

২) পূর্ব কলকাতার-নিকটবর্তী দুটি জায়গায় আবাসন কমপ্লেক্স এবং বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স;

৩) রুবি হাসপাতালের কাছে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে ওয়াটার পার্ক কাম বিনোদন কেন্দ্র;

৪) বাইপাস ও ধাপা রোডের সংযোগস্থলে ৫-৭ স্টার হোটেল

কেএমডিএ-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া এই তথ্যাদির সঙ্গে এও জানা গিয়েছে যে নোনাডাঙ্গার যে অঞ্চলে সম্প্রতি উচ্ছেদ অভিযান চলছে, পিপিপি প্রকল্পের অধীনে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই উপরোক্ত প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা গৃহীত হয়ে রয়েছে। (সূত্র : *আজকের দেশব্রতী*, ২৬.০৪.২০১২)

**প্রধান বিরোধী দলের অবস্থান প্রসঙ্গে**

বর্তমান শালক দলটি যেসব জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করছে তার বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী দলটি শুধুমাত্র মৌখিক বা লিখিত বিবৃতি দেওয়ার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছে, বা বলা ভাল, রাখতে বাধ্য হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসের সমাবেশে বিগ্রেড ভরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও রাস্তায় নেমে দীর্ঘস্থায়ী ও লাগাতার গণআন্দোলন গড়ে তোলার কোনোরকম ইচ্ছা বা ক্ষমতাও তাদের নেই। হয়ত তারা ভাবছেন এইভাবে চলতে থাকলে মানুষজন বর্তমান রাজত্বের ওপর তিতিবিরক্ত হয়ে তাদেরকেই আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার কথা ভাববেন।

কিন্তু এই ভাবনার পেছনে রয়েছে এক অবাস্তব চিন্তা। প্রথমত এটা সবাই জানেন যে '৭৭ সালের পুনরাবৃত্তি হওয়াটা আর কখনোই সম্ভব নয়। তাছাড়া '৬৭ এবং '৬৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যেবাবে প্রথম দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সরাসরি বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেছিল— পরবর্তীকালে কোনো

কেন্দ্রীয় সরকারই আর সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় নি। এবারে ২০০৯ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচন, পৌরসভা-কর্পোরেশন নির্বাচন এবং সর্বোপরি বিধানসভার নির্বাচনে যেভাবে আপামর জনসাধারণ সুস্পষ্ট রায়দানের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন তাতে অন্তত এটা বোঝা গেছে যে তাদের সম্বন্ধে জনগণের মোহ থাকা তো দূরের কথা— তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে সংসদ-সর্বস্ব একটি কমিউনিস্ট পার্টি এত বছর পর ক্ষমতা হারালে যে মতাদর্শগত-তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক কর্মকৌশলের সংকটের মধ্যে পড়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কোনো সৎপ্রচেষ্টা এবং যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার-ভুলত্রুটিগুলি সম্বন্ধে আন্তরিক ও গভীর আত্মসমালোচনার কোনো লক্ষণই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দিনে ক্রমাগত ভাঙ্গন ও বিভাজনের মধ্য দিয়ে যাওয়াটাই তাদের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়াবে। উপরন্তু বর্তমান সরকারের কার্যকলাপ থেকে সিপিএমের নেতৃবৃন্দ একথা বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান নিছক ইতিহাসের 'বিচ্যুতি'— অর্থাৎ পূর্বেকার 'সুশাসন' থেকে বিচ্যুতি। একথা ভুললে চলবে না যে পূর্বেকার অগণতান্ত্রিক জনবিরোধী স্বেচ্ছাচারী শাসনের সিঁড়ি বেয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান ও স্বেচ্ছাচার। এই স্বেচ্ছাচারের উপজাত ফসল যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার তাকেই হুবহু বহন করে নিয়ে চলেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। (এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য— 'অথচ খেলাটা পালটে দেওয়ার সুযোগ ছিল'— অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ এপ্রিল ২০১২ এবং 'ঘুণ ঐতিহ্যেই, দল বদলে তা দূর করা যাবে না'— শিবাজীপ্রতিম বসু, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩১ জানুযারি ২০১২)

**পরিবর্তনের অন্য স্বর...**

২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করার পরই সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন,

> "নতুন করে নির্বাচিত যে কোন শাসকদল ক্ষমতায় এসেই পরিবর্তন ঘটানোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি স্রেফ এক পা পিছু হটে নির্বাচন পরবর্তী প্রত্যাবর্তনের নরম গদিতে আসীন হয়ে যান— ফিরে আসে আত্মম্ভরিতার পুরনো যত অভ্যাস, প্রতিবাদ দমন করার জন্য পুলিশ নামানো ও সেই একই পক্ষপাতদুষ্ট ও নিপীড়নকারী ব্যবস্থা সমূহ। বিশ্বায়নের নয়া উদারনৈতিক বিধিব্যবস্থায় এই সব অভ্যাস বৈধতা লাভ করে— যেখানে ব্যক্তিগত মুনাফার ধান্দায় ব্যক্তি প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষণ হিসেবে তুলে ধরা হয় এবং চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সর্বজনীন প্রয়োজনের থেকেও তাকে বড় করে দেখানো হয়। সর্বসাধারণের এ দাবিগুলো মেটানোর জন্য মমতা ব্যানার্জীর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নয়া-উদারনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বাঁধা পড়ার কারণে তাঁর সরকারকে একেবারে উল্টোমুখে ঘুরে যেতেই হবে এবং তার পূর্বসূরী বামফ্রন্টের অনুসৃত পথ বেয়ে হাঁটতেই হবে।" (*ইপিডব্লিউ*, ৪ জুন ২০১১)

বিগত এক বছরের সরকারের প্রায় সমস্ত কার্যকলাপই নয়া উদারনীতিবাদী অর্থনীতি ও কর্পোরেট বিশ্বপুঁজির স্বার্থের সেবা করে আসছে। নব্বই-এর দশক থেকে শুরু হওয়া বিশ্বায়ন-উদারনীতিকরণ ও বেসরকারিকরণের কর্মসূচিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে সইয়ে নিতে চাইছে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকার। কৃষিক্ষেত্রে অংশীদারি চাষ-প্রথা চালু করা, স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপারে পিপিপি মডেল অনুসরণ করা, শিল্পের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে *সেজ* মডেল বাতিল এবং জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া— উন্নয়নের সেই একমাত্র মডেলকেই উর্দ্ধে তুলে ধরা— অর্থাৎ উচ্ছেদ সহ যাবতীয় পুরনো পন্থাকেই অনুসরণ করা। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ধারাবাহিকতায় জঙ্গলমহলেও যৌথ-বাহিনীর অপারেশনের মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়নের নাম করে বিভ্রান্তি ছড়ানো প্রভৃতিই প্রমাণ করে দিচ্ছে আগামী দিনে সরকারি কাজের অভিমুখ।

**শেষের কথা—**

একজন বন্ধু বলছিলেন যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও তার সরকার শহরের মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী নাগরিক সমাজের সমর্থন-অসমর্থন নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নন— বরঞ্চ তিনি গ্রামীণ সমাজের ভিত্তিকেই ধরে রাখার ব্যাপারে বেশী আগ্রহী। কিন্তু অত সহজ সরল সমীকরণ কোনোমতেই সম্ভব নয়। সামগ্রিক বিচারে বর্তমান সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতি, কৃষিনীতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সমস্যার সমাধানের পদক্ষেপগুলি, বেকার সমস্যা দূরীকরণের কর্মসূচি, জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়ে আনা ও উন্নয়নের প্রচেষ্টাগুলি, গোর্খা জাতিসমস্যা সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি— প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই কিন্তু সরকারি নীতির দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-স্ববিরোধিতা-সীমাবদ্ধতা এমনকি দ্বিচারিতাগুলি দিনের পর দিন প্রকট হয়ে উঠছে। গণতান্ত্রিক পরিবেশের ক্রমাবনতির যে লক্ষণগুলির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে— তার তালিকাও ক্রমশ দীর্ঘায়িত হয়েই চলেছে। সংযোজিত হয়েছে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ফতোয়া, আরাবুল ইসলামের কীর্তি, সর্বভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেলে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর অসহিষ্ণুতাজনিত আচরণ ইত্যাদি। তাই পশ্চিমবঙ্গের আগামী দিনগুলি যে বর্তমান সরকারের কাছে খুব একটা স্বস্তিবাচক হয়ে উঠবে না। একথাটা হয়ত বলাই যায়। (২০.০৫.২০১২)

প্রবন্ধ

# জমি অধিগ্রহণ বিলে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ— অঘটন না বাধ্যবাধকতা

**প্রণব দে**

উড়িষ্যার জগৎসিংহপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা ২০০৫ সাল থেকে পস্কোর জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রাম করে চলেছেন। ২০০৬ সালের ২ জানুয়ারি ঐ উড়িষ্যারই কলিঙ্গ নগরে টাটা-র লৌহ কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সমাবেশে ১২ জন আদিবাসী পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুরের কৃষক টাটার জন্যে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। প্রাণ গিয়েছিল তাপসী মালিক, রাজকুমার ভুলের। ২০০৭ সালে সালেম গোষ্ঠীর অনুকূলে জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম এলাকায় গড়ে উঠেছিল রক্তাক্ত প্রতিরোধ। ২০০৮ সালে মহারাষ্ট্রের রায়গড় অঞ্চলে রিলায়েন্স কোম্পানির সেজ প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ একযোগে জনমত প্রকাশ করে। উত্তর প্রদেশে যমুনা এক্সপ্রেস হাইওয়ে প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ একাধিকবার গুলি চালায়। ২০১০ সালে আলিগড় অঞ্চলে এবং ২০১১ সালে নয়ডা নিকটবর্তী ভট্ট পারাশুলে, পুলিশের গুলিতে দুজন কৃষক নিহত হন। অধুনা ভারতবর্ষে যা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে— বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার জন্য জমি অধিগ্রহণ, কৃষক প্রতিরোধ এবং সরকারের দমনপীড়ন, এগুলো তারই কতকগুলি উদাহরণ। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার, অন্ধ্র, কর্ণাটক— ভারতের রাজ্যে রাজ্যে অধিগ্রহণ বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ থেকে কৃষিজীবী-শ্রমজীবী মানুষের একটাই দাবী উত্থাপিত হয়েছে, জবরদস্তি অধিগ্রহণ নয়, বাণিজ্যিক কারণে কখনোই নয়।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রভাবে এই ক্ষোভের বিস্তার ঘটে ভারতের বৌদ্ধিক সমাজে। সামগ্রিকভাবে কৃষক হত্যা, পুলিশের নির্যাতন, উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে সরব হলেও উন্নয়নের প্রশ্নে বৌদ্ধিক সমাজ দ্বিধাগ্রস্থ। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনায়কদের, তা সে দিল্লীর মনমোহন সিং বা বঙ্গের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা কলিঙ্গের নবীন পট্টনায়ক অথবা ছত্তিশগড়ের রামন সিং, যেই হোক না কেন, সবাইয়ের ভাবনায় অধিগ্রহণ এবং উন্নয়ন অবিচ্ছিন্ন। অধিগ্রহণ না হলে জমি পাওয়া যাবেনা— জমি না পেলে উন্নয়ন হবেনা— আর উন্নয়ন হলে তো কথাই নেই— শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, আই-টি হাব, নতুন নতুন শহর, ছয় বা আট লেনের রাস্তা, কোথাও কোথাও বৃহৎ সংস্থার 'সেজ'। মধ্যবিত্তের ভাবনায়— 'সবকিছু আমাদের জন্য'। সমাজ ত্রিধাবিভক্ত— বিক্রেতা কর্পোরেট পুঁজি, ভোক্তা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত, অপহৃত গ্রামীণ শ্রমজীবী সম্প্রদায়। মিডিয়ার বিতর্কে নানা ফর্মুলার ভিড়। কারোর দাওয়াই 'উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণ নয়', কারোর মতে 'শিল্প হবে বন্ধ্যা মাটিতে', অনেকেই বলেন 'ক্ষতিপূরণ বাড়াতে হবে, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে'। ক্ষতিপূরণ নিয়েও প্রশ্ন উঠল, শুধুমাত্র জমির ক্ষতিপূরণ নাকি জীবিকারও ক্ষতিপূরণ। কে পাবে ক্ষতিপূরণ, শুধুমাত্র জমির মালিক নাকি জমির উপর নির্ভরশীল অন্যান্যরাও। মিডিয়া বিতর্কে তৃতীয় পক্ষ অনুপস্থিত, তাদের দাবি কোথাও আমল পায়না। কেউ বলেনা, এই সব বিতর্ক আসেই না, যদি উন্নয়নটা সত্যই জনস্বার্থে হয়, জনগণকে সামিল করে হয়।

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল ১৮৯৪ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন। দাবি উঠল, শতাব্দী প্রাচীন এই আইন বদলাতে হবে। ওটাই নাকি যাবতীয় গন্ডগোলের মূল। বাজার অর্থনীতির শুদ্ধ তার্কিকেরা প্রশ্ন তুললেন, উদ্যোগপতিরা বাজারমূল্যে জমি কিনে নেবে না কেন? অমর্ত্য সেনও শেষ পর্যন্ত মত দিলেন, 'বাজার অর্থনীতির নিয়ম মেনে সিঙ্গুরে টাটাদের জমি কিনে নেওয়া উচিত ছিল'। বিরুদ্ধবাদীদের, মায় সিপিএম-এর, যুক্তি ছিল 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত বিশিষ্ট ভূখণ্ডে বেশি পরিমাণ জমি কেনার ধকল উদ্যোগপতিরা নিতে পারবে না। উন্নয়নের স্বার্থে অধিগ্রহণই একমাত্র রাস্তা'। পুঁজিপতি ব্যবসা করবে এবং সেটাকে জনস্বার্থ বলে মেনে নিতে হবে, এর থেকে বড়ো চালিয়াতি আর হয়না। কিন্তু সরকার সেটাই করতে চায়। সরকারের সেটা দায়। প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার দেশি-বিদেশি সংস্থার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করে বসে আছে। কেউ খনিজ সম্পদ কুক্ষিগত করবে, কেউ নগরায়ণ করবে, কেউ ব্রিজ বা রাস্তা তৈরি করবে। লাভ ব্যবসাদারের, কিন্তু জমি জোগাড়ের দায়িত্ব সরকারের। সেখানে ব্যবসাদার কানাকড়ি খরচ করবে না। কারণ বিশ্বায়নের অর্থনীতি। পুঁজির যাত্রাপথ পরিষ্কার করার দায় সরকারের। আবার ওদিকে গণতন্ত্রেরও একটা দায় আছে। সরকারে থাকতে গেলে ভোটে জিততে হয়। দেশ খুব বেশি অশান্ত হয়ে উঠলে, ভোট পেতে এবং ক্ষমতা ধরে রাখতে অসুবিধা হয়। ক্ষোভ প্রশমনের জন্য লোকভোলানো কিছু কর্মসূচি সরকারের হাতে আছে— একশ দিনের কাজ কিংবা বিপিএলে সস্তায় চাল। কিন্তু অধিগ্রহণ-বিরোধী বিক্ষোভে এই সব দাওয়াই কোন কাজ দেয়না। এদিকে ২০০৯ সালের নির্বাচন সমাগত। প্রথম ইউপিএ সরকার ২০০৭ সালের শেষদিকে প্রস্তাব করল, প্রতিরক্ষা ও পরিকাঠামো নির্মাণে অধিগ্রহণ জারি থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা উদ্যোগপতিদের অন্তত ৭০ শতাংশ জমি সরাসরি কিনে নিতে হবে। বাকি ৩০

শতাংশ সরকার অধিগ্রহণ করে দেবে। চারশো বা ততোধিক পরিবার উচ্ছেদের সম্মুখীন হলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য পুনর্বাসনের চেহারা-চরিত্র ব্যাখ্যা করা হয়নি। সরকার শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বিলটি পাশ করাবার কোন উদ্যোগ নেয়নি। সরকারি প্রস্তাবে বাজার অর্থনীতির নিয়ম-রীতি কতটা রক্ষিত হয়েছিল, সে প্রশ্নে আমরা যাচ্ছি না। যেটা উল্লেখ্য, সেটা হলো, এই সংশোধনীতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা বাঁক লক্ষ্য করা গেল। বেসরকারি প্রকল্পগুলিকে সরকার কৌশলে 'জনস্বার্থের' অঙ্গীভূত করে নেওয়ার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারে জয়রাম রমেশ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণের পর ওয়েবসাইটে একটি খসড়া প্রকাশ করে, সাধারণের থেকে বিতর্ক আহ্বান করেন। রমেশ মশাই ইতিপূর্বে পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন এবং সেখানে পস্কো প্রকল্পে, গ্রামবাসীদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে, উড়িষ্যা সরকারকে বনাধিকার আইনে ছাড়পত্র দিয়ে কর্পোরেট দুনিয়ার সুনাম অর্জন করেছেন। পস্কো কাণ্ডে রমেশ মশাইয়ের মুন্সিয়ানা দেখেই, সম্ভবত তাঁর উপর অধিগ্রহণের মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। ২০১১-এর সেপ্টেম্বরে, রমেশ মশাই, পূর্বোক্ত খসড়ার সূত্র ধরে নতুন এক আইনের প্রস্তাব রাখলেন— Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act,2011।

নয়া আইনের মূল লক্ষ্য ছিল বেসরকারি উদ্যোগগুলিকে জনস্বার্থের অন্তর্ভূক্ত করা। একটা ছোট শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো, বেসরকারি সংস্থাকে প্রকল্পভুক্ত আশি শতাংশ মানুষের সম্মতি নিতে হবে। 'ক্রয় করার' পরিবর্তে 'সম্মতি গ্রহণের' প্রস্তাব রাখা হলো। পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দু'/চারগুণ বৃদ্ধি করার এবং সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেওয়া হলো। প্রশ্নটা সম্মতি বা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নয়। ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্পন্ন, মুনাফা অভিলাষী কোনও উদ্যোগকে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ জনস্বার্থ আখ্যা দিতে পারে কিনা, এটা একটা নীতির প্রশ্ন। বেসরকারি উদ্যোগকে জনস্বার্থ আখ্যা দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, যাতে সাধারণ মানুষের সহায়-সম্পদ জনস্বার্থের নামে অধিগ্রহণ ক'রে, বেসরকারি মালিকদের উপঢৌকন দেওয়া যায়। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে রমেশ মশাই সমালোচনার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। সমালোচনার ঝড় কিন্তু উঠলো। ইউপিএ-র শরিক দলগুলিও রমেশ মশাইয়ের প্রস্তাবে একমত হতে পারে নি। পার্লামেন্টে বিতর্ক এড়াতে, প্রস্তাবিত বিলটি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এ পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু নেই। গতানুগতিক পথেই রমেশ মশাই হেঁটেছিলেন। কিন্তু সুমিত্রা মহাজনের স্ট্যান্ডিং কমিটি এক অঘটন ঘটালো। গত ১৭ মে (২০১২) তারিখে, স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ লোকসভায় পেশ করার পর সভা অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো, স্ট্যান্ডিং কমিটি গতানুগতিক পথে বিলটি অনুমোদন না করে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে অধিগ্রহণের প্রস্তাব একেবারে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। কমিটির বক্তব্য— ''উৎপাদনের প্রধান উপাদান তিনটি— জমি, শ্রম ও পুঁজি। শ্রম এবং পুঁজির ক্ষেত্রে, প্রান্তিক স্তরেও, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের প্রশ্ন যেখানে ওঠেনা, সেখানে রাষ্ট্র কেন বেসরকারি, পিপিপি, এমন কী সরকারি উদ্যোগের জন্যও, তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান, জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে নিজেকে জড়াবে? আমেরিকা, কানাডা, জাপানের মতো উন্নত দেশে এই ধরনের সংস্থাগুলি যখন জমি কেনাতে অভ্যস্থ, তখন ভারত কেন একবিংশ শতাব্দীতে এই প্রকার বিসদৃশ প্রক্রিয়া আঁকড়ে থাকবে? সুতরাং, খসড়া বিলে উল্লিখিত 'জনস্বার্থ' কেবলমাত্র সরলরৈখিক পরিকাঠামো এবং বহুমাত্রিক বাঁধ সহ সেচ এবং সরকারি ব্যয়ে তৈরি স্কুল, হাসপাতাল, পানীয় জল নির্মলীকরণ প্রকল্পের মতো সামাজিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।'' কমিটি 'জনস্বার্থের' সংজ্ঞা থেকে 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রোজেক্টের (পিপিপি)' জন্য এবং 'বেসরকারি কোম্পানির' জন্য জমির সংস্থান করার ধারাগুলি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে। উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে অধিগ্রহণ আইনের প্রয়োগও বাতিল করার সুপারিশ করেছে।

দুই, রমেশ মশাইয়ের প্রস্তাবিত বিলে বলা হয়েছিল, কোনও কোম্পানি যদি ১০০ একর বা তার বেশি জমি কেনে, সে ক্ষেত্রে 'পুনর্বাসন ও পুনঃসংস্থাপন আইন' (Rehabilitation and Resettlement) প্রযুক্ত হবে। কমিটি মনে করে, ''জমি ক্রয়-বিক্রয় যেহেতু সংবিধান অনুসারে রাজ্য তালিকা ভুক্ত, সেহেতু এই ক্ষেত্রে পুনর্বাসন বিধান রচনা রাজ্যেরই দায়িত্ব। জমির প্রাপ্যতা এবং জন-ঘনত্ব বিচার করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য জমির উর্ধ্বসীমা স্থির করবে।'' অর্থাৎ, ক্রীত জমির পরিমাণ যদি একশ একরের কমও হয়, রাজ্য ইচ্ছা করলে নিজস্ব পুনর্বাসন নীতি প্রয়োগ করতে পারে।

তিন, কমিটি অধিগ্রহণ আইনে ''গ্রাম সভার'' (এবং মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলে অনুরূপ স্তরে) সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অথবা অন্তত অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে।

চার, কমিটি, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে, বিশেষত পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশীল ভুক্ত এলাকায়, অধিগ্রহণ যথাসম্ভব স্থগিত রাখার সুপারিশ করেছে। জনস্বার্থে কোন প্রকল্প একান্ত আবশ্যক হলে, অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও একই ধরনের বাস্তুতন্ত্র বিশিষ্ট অঞ্চলে এমন ভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছে, যাতে আর্থিক সুযোগসুবিধা, ভাষা, আদিবাসী সম্প্রদায়ের

সংস্কৃতি এবং কৌম জীবন অক্ষুণ্ণ থাকে। PESA-র আইনগুলি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে।

পাঁচ, কোন প্রকার কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করলেও একেবারে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ কমিটি করেনি। তবে খাদ্য সমস্যার কথা মাথায় রেখে, রাজ্যে বা জেলায় মোট কৃষিজমির কত শতাংশ পর্যন্ত অধিগ্রহণ করা যাবে, রাজ্যগুলিকে তার একটা সীমারেখা স্থির করার পরামর্শ দিয়েছে।

ছয়, কমিটির সুপারিশ হচ্ছে, অভিন্ন একটি আইনেই অর্থাৎ প্রস্তাবিত LARR আইনের মাধ্যমেই যাবতীয় অধিগ্রহণ করতে হবে। এই আইনের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্রস্তাব সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অন্য কোন কেন্দ্রীয় আইন এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবেনা।

সংক্ষিপ্ত আকারে এইগুলি হলো স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রধান সুপারিশ। স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশের তাৎপর্য এটাই, কমিটিতে শাসক কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপি-র প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও, এমন একটা মত কমিটি গ্রহণ করল, যা উক্ত দলগুলির দলীয় বক্তব্য নয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের যে যজ্ঞ চলছে, তার ঋত্বিক কংগ্রেস-বিজেপি উভয়েই এবং আলোচ্য জমি অধিগ্রহণ বিলটি সেই 'উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়ন' যজ্ঞেরই ফসল। প্রাদেশিক স্তরে ক্ষমতাসীন অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও নব্য অর্থনৈতিক উদারনীতির শরিক। এহেন রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির এরকম বেসরকারি কোম্পানি তথা কর্পোরেট পুঁজি বিরোধী সুপারিশ বেশ কিছুটা অপ্রত্যাশিত এবং প্রথা বিরোধী। এটা কী অঘটন, না ভারতের বর্তমান রাজনীতির বাধ্যবাধকতা?

ভারতের রাজনীতির একটা বৈশিষ্ট্য হলো এদেশে অর্থনীতি এবং রাজনীতির গতি সমান তালে চলতে পারছে না। ইন্ডিয়ার উন্নয়ন টিমের ক্যাপ্টেনরা যত দ্রুত এবং যে ব্যাপকতায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উন্নয়নের মডেলে দেশটার পুনর্গঠন চাইছে, ভারতের রাজনীতি কিন্তু সেই গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে না। ১৯৯১ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক উদারীকরণের যাত্রা শুরু। কংগ্রেসের পর বিজেপি-র নেতৃত্বে এনডিএ সরকার আগ্রাসী উদারীকরণের পথ গ্রহণ করে। ২০০৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি-র "সাইনিং ইন্ডিয়া" শ্লোগানের ব্যর্থতা শাসক শ্রেণীর কাছে বার্তা পাঠায় যে, সাধারণ মানুষ নব্য উদারীকরণজাত উন্নয়নের মডেল প্রত্যাখান করেছে। প্রথম ইউপিএ-র শাসনকালেই শুরু হয় উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনের ব্যাপকতা এমন স্তরে পৌছয় যে, ২০০৯-এর সাধারণ নির্বাচনে ইউপিএ সরকার তাদের সাধের উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড পেশ করতে ভয় পেল। নির্বাচনে ইস্যু করা হলো '১০০ দিনের কাজের' মতো সামাজিক প্রকল্পগুলিকে। বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে ২০১১-এ পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ভরাডুবি তো সবাই প্রত্যক্ষ করেছে। শাসক শ্রেণী এখন নানা দল-উপদলে খণ্ড-বিখণ্ড। এই দলগুলির মধ্যে স্বার্থভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। এর উপর উচ্ছেদ বিরোধী গণ-আন্দোলন নির্বাচনী সাফল্য লাভে তাদের মধ্যে বাড়তি সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। আর তার ফলেই কখনও কখনও কোন কোন ইস্যুতে শাসক শ্রেণীর অভ্যন্তর থেকেই সাময়িক বাধা উপস্থিত হচ্ছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ তৃণমূল দল, যারা বরাবর শাসক দলের (ভিন্ন ভিন্ন দল হলেও) জোটসঙ্গী, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুমোদিত উন্নয়নের রূপরেখায় বিশ্বাসী কিন্তু একই সঙ্গে ধীরে চলো পন্থী।

কিন্তু শাসক শ্রেণীর এই সংশয় বা বাধা নিতান্ত সাময়িক। এই বাধা দূর করতে সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার কসুর নেই। দিল্লীর ক্যাপ্টেনরা তো ওয়াশিংটনের আজ্ঞা পালনে সদা তৎপর। আর স্বার্থ না থাকলে হিলারি ক্লিনটন কলকাতায় পা রাখতেন না, এটা সবাই বোঝে। কাজেই স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকার যে গ্রহণ করতে পারবে না, এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। জয়রাম রমেশ জানিয়েও দিয়েছেন, স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশ তিনি মানবেন না। দরকার হলে তিনি নতুন বিল আনবেন। বড় জোর পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বিতর্ক মুলতুবি রাখতে পারে।

সুতরাং শাসক শ্রেণীকে সংযত রাখতে ভরসা সেই সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের জনগণ আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দেউলিয়া রাজনৈতিক শক্তিগুলি সুযোগসন্ধানী এবং তারাও শ্রমজীবী মানুষের প্রতিপক্ষ। ট্রাজেডি এটাই, ভারতের শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক এই সংগ্রামকে সংহত রূপ দিতে কোন রাজনৈতিক শক্তি এই মুহূর্তে অনুপস্থিত। আর সান্ত্বনা এটাই যে, জীবন-জীবিকা রক্ষার নিজস্ব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের মানুষ তাদের শ্রেণী রাজনীতিটা চিনে নিচ্ছে।


বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

**স্বাস্থ্যের বৃত্তে**

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে
আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধানসভা পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডা. শুভজিত ভট্টাচার্য (উমুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শিয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনে বইয়ের স্টল।

*পাঠক ও এজেন্টদের যোগাযোগের ফোন নম্বর :*
৯৮৩০৯২২১৯৪/৯৩৩১৯১২৫৩৭

**প্রবন্ধ**

# পারস্পরিক অভিযোগের খেলা

সি পি চন্দ্রশেখর

ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যিক তেল কোম্পানীগুলি— ইণ্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, কিছুটা সংযত হয়েছে। মে মাসে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৬.২৮টাঃ বাড়িয়ে, এখন তারা আংশিক ভাবে প্রতি লিটারে ১.৬৮টাঃ হারে দাম কমাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা বিপুল মুনাফা করছে, এই ধরণের "মিথ্যা ধারণার" বিরুদ্ধে কোম্পানীগুলি প্রচার শুরু করেছে, যার ফলে প্রশাসনিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। পেট্রোলের সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এবং ইউপিএ-র অভ্যন্তরে বা বাইরে রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া, তাদের প্রচারে নামতে প্ররোচিত করেছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রী এ কে এ্যান্টনি এবং ভায়লার রবিও সমালোচনা করে বলেছে, বাণিজ্যিক তেল কোম্পানীগুলি যেখানে উচ্চমাত্রায় লাভ করছে, সেখানে মূল্য-বৃদ্ধির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা কঠিন।

বাঁধাধরা গতেই তেল কোম্পানীগুলি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। তাদের বক্তব্য, আন্তর্জাতিক স্তরে তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং টাকার মূল্যহ্রাস, তাদের ঘাড়ে বিপুল লোকসানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সরকার এবং ওএনজিসি, অয়েল ইন্ডিয়া লিঃ ও গেইল-এর মতো তেল উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলি যে সাহায্য দিচ্ছে, সে জন্য এবং কম দামের কারণে এটা বোঝা যায়না। এই সাহায্যের পরেও, মূলধনী এবং অন্যান্য খাতে ব্যয় ধরলে, ততটা লাভ থাকেনা, যতটা ভাবা হচ্ছে। উদ্বৃত্ত কিছুটা কমিয়ে বাণিজ্যিক তেল কোম্পানীগুলি বর্দ্ধিত মূল্যের কিয়দংশ বহন করার জন্য এটা সম্ভব হয়। ঘটনাক্রমে, আমদানীকৃত এবং দেশীয় কোম্পানীগুলি থেকে ক্রীত অপরিশোধিত তেলের দাম মোট দামের ৯২ শতাংশ। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রশাসনিক ব্যয় খুব বেশি নয়, কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বাণিজ্যিক তেল কোম্পানীগুলি যে বেশ বাড়িয়ে বলছে, এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তাদের সমর্থনে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, তেলের উচ্চ আন্তর্জাতিক মূল্য এবং ক্রমহ্রাসমান মূল্যের টাকার বোঝার বৃহদংশ ভোক্তাদের ঘাড়ে চালান করার জন্য তারা একা চেষ্টা করছে না। বরং, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি, তেল উৎপাদনকারী এবং বাণিজ্যিক তেল কোম্পানীগুলি— এরা প্রত্যেকে তেল অর্থনীতি থেকে প্রাপ্যে যাতে ঘাটা না পড়ে, সতত তার জন্য সচেষ্ট থেকেছে এবং প্রাপ্তি বৃদ্ধির জন্য সক্রিয় থেকেছে। আমদানী করা তেলের দাম যখন টাকার অঙ্কে কমতে থাকে, তখন এটা করা সহজ কারণ অন্তিম পণ্যের (end product) দামে যৎসামান্য সামঞ্জস্য করা হয় (আদৌ যদি হয়ে থাকে) এবং তাও হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে। সমস্যা হয়, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।...

দাম বৃদ্ধির প্রভাবকে আংশিক প্রশমিত করার একটা উপায় হলো, অন্তিম পণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং তার বোঝা ভোক্তাদের কাঁধে চালান করা। এটা কতটা করা যাবে, তা রাজনীতির উপর নির্ভর করে, যদিও নীতিগতভাবে তা উচিত নয়। এইভাবে দাম না বাড়িয়ে, এই ভার অন্যান্য পক্ষের মধ্যে পুনর্বণ্টিত হওয়া উচিত। কার কতটা ক্ষমতা, তার উপর ফলাফল নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক তেল কোম্পানীগুলিকে, যতটা তারা উচিত বলে মনে করে, তার থেকে বেশি দায় বহন করতে এগিয়ে আসতে হবে।

এক্ষেত্রে একটা নমণীয় পক্ষ হচ্ছে সরকার। পেট্রোলিয়াম পণ্যের উপর কর কমিয়ে অথবা ভর্তুকি বাড়িয়ে সরকার মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পড়াতে পারে, কেননা করের মাধ্যমে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ সরকারের আছে। এই পথ গ্রহণ করলেও, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির বোঝা অধিকসংখ্যক পক্ষ গুলি র মধ্যে পুনর্বণ্টিত হয়। দুর্ভাগ্যজনক-ভাবে সরকারের নীতি হচ্ছে, রাজনৈতিক ভাবে যতটা সম্ভব, এই বোঝা সর্বশেষ স্তরের ভোক্তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং তারপর তেল অর্থনীতির প্রভাবশালী পাণ্ডাদের হাতে বাকিটা ছেড়ে দেওয়া।

ফলত, না আছে কোন সুদৃঢ় নীতি, না আছে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলায় অভ্যন্তরীণ স্তরে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ইউপিএ এক উদ্দেশ্যবিহীন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। অতীতে যেমন ছিল, বিতর্কের কেন্দ্র হলো, কোন পক্ষ এই হিসাব-নিকাশের বোঝা বহন করবে এবং কে কতটা পরিমাণে দায় নেবে। এটা নতুন কোন বিতর্ক নয়। এই বিতর্ক আগেও দেখা গেছে, বিশেষত ২০০৭-০৮ সালে, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ১০০ ডলার অতিক্রম করেছিল।

২০০৭-০৮ সালে, তেলের আমদানী খরচ ডলারের মানে যখন বৃদ্ধি পেল, টাকার মানও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং, টাকার মানে আমদানী খরচ আনুপাতিক হাড়ে বাড়েনি। ডলারের তুলনায় টাকার মান বৃদ্ধির কারণে, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব, ভারত আংশিকভাবে প্রতিহত করতে পেরেছিল। এইবার ডলারের হিসাবে তেলের দাম বেড়েছে এবং বেশ উচ্চ স্থানেই অবস্থান করছে। অপরদিকে টাকার মান

নিম্নমুখী। এছাড়া, ডলার মূল্যে আমদানীকৃত তেলের দাম যে সময়ে থমকে ছিল এমন কী কমেছে, অবমূল্যায়নের দরুণ টাকার দামে তা প্রায়শ বেড়েছে। সুতরাং, ডলারের হিসাবে মুল্যবৃদ্ধির জন্য যতটা প্রয়োজন ছিল, অন্তর্দেশীয় স্তরে তার তুলনায় অনেক বেশি এবং দীর্ঘতর সময়ের জন্য হিসাব-নিকাশ করতে হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নীতির জন্য, আন্তর্জাতিক স্তরে তেলের মূল্য-বৃদ্ধিকে দায়ী করা যায় না— এমন কথা মাঝেমধ্যে বলা হয় থাকে। চাহিদা-যোগানের বিষয়টা আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষুদ্র এক ভূমিকা পালন করলেও, মূল্যবৃদ্ধির জন্য অধিকাংশ পরিমাণে দায়ী ইরান বনাম আমেরিকার সংঘাতের মতো ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলি এবং একই সাথে তেল বা তেল সম্পর্কিত বাজারে ফাটকাবাজি। টাকার অঙ্কে যখন বিচার করা হয়, নীতি অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যদি বিশ্ব-বাণিজ্যের এবং পুঁজির সঙ্কটকে টাকার অবমূল্যায়নের জন্য দায়ী করাও হয়, তাহলেও বলতে হয়, টাকার মান ধরে রাখার জন্য আরও অনেক পথ খোলা আছে, যা সরকার চেষ্টা করে দেখতে পারত। সুতরাং, ২০০৮ সালের বিপরীতে, আমদানীকৃত তেলের টাকার অঙ্কে দাম পরিবর্তনের অভিযোগের দায় সরকারকেই নিতে হবে। দায়ভার বণ্টনের বিতর্কে, অনেকের মতে, এ বিষয়টা মাথায় রাখা উচিত।

যাই হোক, এই বিষয়গুলোকে চাপা দিয়ে, অধুনা তীব্র প্রচার চালানো হচ্ছে যে, বাজেটে ভর্তুকি দিয়ে, তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব থেকে উপভোক্তাদের সুরক্ষা দানের নামে ''অর্থনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানহীনতা'' চলছে। এই ধরণের প্রচার, সকল প্রকার ভর্তুকির বিরুদ্ধে নয়া উদারনৈতিক প্রয়াসেরই অংশ এবং মূল্য বিনিয়ন্ত্রণকে ও দামের ''সমতা বিধানকে'' আনুকুল্য প্রদান করে।... যারা তেল অর্থনীতি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশে ক্ষয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, তাদের একাংশ এই সব যুক্তি প্রদান করে। পরিশেষে, এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করা হয় যে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, অন্তিম পণ্যের দামে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সামঞ্জস্য আনতে হতে না দেওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক স্তরে মূল্যবৃদ্ধি হয়।

সরকারের একটা অংশের ধারণা, উপভোক্তাদের দাম দেওয়ার যে সমস্যা, তা আংশিক ভাবে সমাধান হয়েছে। ভারত, পেট্রলের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া থেকে সরে এসেছে। কেবলমাত্র ডিজেল, এলপিজি ও কেরোসিনের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ ও দায়ভার বহনের বিষয়টি বজায় আছে। যুক্তি ছিল, অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তিরাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে পেট্রল ব্যবহার করে। সুতরাং, পেট্রলের উপর থেকে বাহ্যিক কিংবা অন্তর্নিহিত ভর্তুকি তুলে নিলে, প্রকৃত ভর্তুকির লক্ষ্যপূরণে সাহায্য করবে আশা করা যায়।

পেট্রলের দাম বৃদ্ধি এবং আবার তার আংশিক পশ্চাদগমনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক বিতর্ক ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, লড়াই এখনও শেষ হয়ে যায়নি। রাজ্য বিধানসভাগুলিতে সাম্প্রতিক নির্বাচনের প্রেক্ষিতে পেট্রলের দাম বাড়ানো যায়নি এবং নির্বাচনের পর ঘোষিত বৃদ্ধি আবার বিপরীতমুখী হচ্ছে। এই বিতর্কের জন্যই সরকারের পক্ষে ডিজেল, এলপিজি ও কেরোসিনের উপর থেকে ভর্তুকি হ্রাস করা কষ্টকর হচ্ছে। পেট্রলের দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও দায়ভার বহনের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

তেল এবং মুদ্রার যুগ্ম অভিঘাতের মোকাবিলায়, সরকারের পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বিকল্পের কোনটির উপর নির্ভর করা উচিত, তা নিয়ে বিতর্ক চলমান। এই বিকল্পগুলি হলো, ১) খুচরো দাম বৃদ্ধি; ২) খুচরো দাম অপরিবর্তিত রাখতে শুল্ক হ্রাস এবং শুল্ক হ্রাসের সুবিধা বাণিজ্যিক তেল কোম্পানীগুলিকে প্রত্যর্পণ; ৩) যে সব কোম্পানীগুলি তেল উৎপাদন এবং অপরিশুদ্ধ তেল রপ্তানীর সঙ্গে জড়িত, তাদের অতি-মুনাফার উপর কর বসিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধি, যাতে বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলির ক্ষতিপূরণ করা যায়; ৪) ভারতের সুউচ্চ বিত্তবান সম্প্রদায় এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির উপর অতিরিক্ত কর বসিয়ে অথবা কর-ছাড়ের পরিমাণ কমিয়ে সম্পদ সৃষ্টি, যাতে ভর্তুকির সাহায্যে, তেলের আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব থেকে সাধারণ উপভোক্তাদের সুরক্ষা দেওয়া যায়; ৫) বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলির লোকসান জনিত ক্ষতিপূরণ করতে ঋণ নেওয়া।

সরকার মনে করে, তারা কার্যসিদ্ধিতে সক্ষম এবং অন্তিম-পণ্যের মুল্য বৃদ্ধির বিরোধিতা করা হলেও, সামলে নিতে পারবে। সমস্যা হলো, মূল্যবৃদ্ধির হারকে কোনমতেই 'সীমিত' বলা যাচ্ছেনা এবং ইতিমধ্যেই ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রাস্ফীতির বোঝার উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে। যেটা বিচক্ষণ ও শোভন হবে, তেল-সঙ্কট সামলাতে অন্যান্য বিকল্পগুলি মিলিয়ে-মিশিয়ে গ্রহণ করা, যাতে দাম এক রাখা যায়। কয়েকটি রাজ্য সরকার পেট্রল পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস করেছে। কিন্তু তাদের আর্থিক হাল যা, সবাইকার পক্ষে এটা বাস্তবোপযোগী নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি প্রয়োগে নারাজ, রাজ্যগুলিকে তা অনুসরণ করতে হচ্ছে। তাছাড়া, যে সব রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে, সেখানে কোথাও কোথাও এই রাস্তা গ্রহণ করে, যাতে বিরোধি পক্ষ শাসিত রাজ্যগুলিতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে সরকারের বিরুদ্ধে চালিত করে কেন্দ্রের থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু কেরালা অভিজ্ঞতা বলছে, এটা খুব কার্যকরী কৌশল নয়। তেলের মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলায়, ভর্তুকি এবং নতুন করের সন্নিবেশ ব্যতীত সরকারের আর কোন উপায় আছে বলে মনে হয়না। কিন্তু তার জন্যে দরকার, ইউপিএ-র উপর থেকে নয়া উদারনৈতিক চিন্তার মুঠি শিথিল করা।

উৎস- ফ্রন্টলাইন, ১৬-২৯ জুন ২০১২

**গ্রন্থ সমালোচনা**

# উন্নয়ন-এর বিকল্প

রতন খাসনবিশ

উন্নয়ন তত্ত্বের পেছনে মতাদর্শ থাকে, মতাদর্শের পেছনে শ্রেণীস্বার্থ থাকে। ইদানিং উন্নয়নের যে ঢেউ তোলা হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে, তার কুশীলবরা দুটি কাজ খুব যত্ন করে করেছেন। উন্নয়নের মতাদর্শগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনাকে তাঁরা অবান্তর করে দিয়েছেন মানুষের মস্তিষ্কে এই কথাটা ঢুকিয়ে যে উন্নয়নের মোদ্দা কথাটা হলো আয়বৃদ্ধি— দেশের আয়বৃদ্ধি, যেটা প্রতিফলিত হয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং যার মাপটা আসে গ্রস অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির অঙ্কে। অঙ্কটিকে সংক্ষেপে বলে জিডিপি বৃদ্ধির হার। এই হারটিতে মন্দগতি দেখা দিলে বিশেযজ্ঞরা চিন্তিতমুখে ঘুরে বেড়ান, টিভি-র 'টক শো'-তে এই মন্দগতির জন্য সরকারের মুণ্ডপাত করেন বিরোধীপক্ষ আর জিডিপি বৃদ্ধির হারে ত্বরণ দেখা দিলে মন্ত্রী-আমলারা খুশি খুশি ভাব করে সাক্ষাৎকার দিতে থাকেন গণমাধ্যমে। আপামর জনগণের মাথায় এই তথ্যগুলি ঢোকানো হয় এবং জিডিপি বৃদ্ধির হলেই উন্নয়ন হয় কিনা এ আলোচনা অবান্তর হয়ে পড়ে। উন্নয়নের মতাদর্শ হলো জিডিপি বৃদ্ধির উপায় খোঁজার মতাদর্শ— এটা মোটের ওপর সবাই মেনে নেন। জিডিপি বাড়লে হাসিম শেখ বা রামা কৈবর্তর অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হয় কিনা এই কূটপ্রশ্ন তোলার লোকই কমে যাচ্ছে এই উন্নয়নের ধাক্কায়।

এই কূটপ্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে কারণ মতাদর্শের পেছনে যে শ্রেণীস্বার্থ থাকে, এই কথাটাই তত্ত্ব-চর্চার জগৎ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। কাজটায় নেতৃত্ব দিয়েছেন জিডিপি-ওয়ালারা। তবে বহিষ্কারের কাজটা সহজ করে দেওয়ার পেছনে এঁদের সমালোচক বা ক্রিটিকদের অবদানও কম নয়। জিডিপি-কেন্দ্রিক উন্নয়নতত্ত্বের যাঁরা সমালোচক, তাঁদের একটা বড় অংশ এখন ভাবেন 'স্টেক হোল্ডার'দের কথা। সেখানে আসে 'আদিবাসী' বা 'মূলবাসী'দের কথা, আসে কমিউনিটির কথা, আসে 'নারী' বা 'ধর্মীয় সংখ্যালঘু'র কথা, আসে প্রান্তিক মানুষ'দের কথা। এই উন্নয়ন তত্ত্বের কেন্দ্রে আছে শ্রমশক্তির মালিকের সঙ্গে পুঁজির লড়াই, যে লড়াইকে কেন্দ্র করে আসে পুঁজির সঞ্চয় (accummulation)-এর বাধ্যবাধকতা আর যে বাধ্যবাধকতা থেকে আসে জিডিপি বৃদ্ধির উন্মত্ত তাগিদ, উন্নয়নের মতাদর্শ যা 'স্বাভাবিক' বলে প্রতিষ্ঠিত করে জনমানসে— এই আদিসত্যটি চাপা পড়ে নানাবিধ 'স্টেক হোল্ডার'-কেন্দ্রিক ডিসকোর্সে। আদিসত্যটি ঢাকা পড়ায় মতাদর্শের শ্রেণীস্বার্থ খোঁজার তাগিদ কমে। শ্রেণীস্বার্থ খোঁজার তাগিদ কমায় উন্নয়ন বিতর্ক শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় স্টেকহোল্ডারদের 'স্পেস' খোঁজার বিতর্কে। জিডিপি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন মতাদর্শে কোনো ছাড় না দিয়েই উন্নয়নের কুশীলবরা এই 'স্পেস' দেবার সমস্যাটা দুঃখী দুঃখী মুখ করে শুনে যান এবং তারপর হাজির করেন 'উন্নয়নের মানবিক মুখ' আনার কর্মসূচি, তৈরি করেন 'ইনক্লুসিভ গ্রোথ'-এর তত্ত্ব।

'Beyond Development' পড়তে গিয়ে চমকিত হলাম এর 'Preface' বা সূচনার শেষ লাইনটি পড়ে। বইটি চাইছে 'বিকল্প উন্নয়ন' নয়, উন্নয়ন-এর বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা উজ্জীবিত করতে (It tries to... provoke thinking for an 'alternative to development')। উন্নয়ন অর্থে যা আমরা দেখি তার সমালোচনাও কম হয় না। অনেক ন্যায্য কথা থাকে এই সব সমালোচনায়। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই উন্নয়ন প্রকল্পের যা সমালোচনা, তার অনেকটাই ঘটে বিদ্যমান উন্নয়নের মতাদর্শের চৌহদ্দির মধ্যেই। জিডিপি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পের সমালোচনায় আমরা বিদ্যমান মতাদর্শগত পরিমণ্ডলের মধ্যেই 'বিকল্প উন্নয়ন'-এর কথা বলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। এই উন্নয়নের মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে দরকার 'বিকল্প উন্নয়ন' নয়, দরকার এই জিডিপি-কেন্দ্রিক উন্নয়নের বিকল্প খোঁজা। বইটির সূচনাতেই এই তাগিদের কথাটা বলা হয়েছে। এ বই অন্য ধরনের বই। এর আরও প্রচার হওয়া দরকার।

উন্নয়নের মতাদর্শটাই কেন জনবিরোধী, এই সংকলনের প্রথম দুটি প্রবন্ধে অল্প কথায় খুব স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক অমিত ভাদুড়ি ও অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য। এই উন্নয়নের মতাদর্শটাই জনবিরোধী, কেননা এই উন্নয়নের মতাদর্শ রচিত হয়েছে পুঁজির প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে। অধ্যাপক ভট্টাচার্যর ভাষায়, এটা হলো ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তী যুগের উন্নয়ন মতাদর্শ, যখন সারা পৃথিবী জুড়ে পুঁজি নেমেছে 'লং মার্চ'-এ (Capital is now, globally speakin, on a long march)। 'উন্নয়ন' হবে পুঁজির প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে, বিনিয়োগে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলি বাছা হবে পুঁজির প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে। এর সঙ্গে জনহিতের কোনো সম্পর্ক নেই । সমগ্র গ্রাম ভারতকে বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত করে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ভারতের বড় শহরে আইপিএল খেলার জন্য বিদ্যুতের বন্যা বইয়ে দেওয়া হবে, যেহেতু 'প্রমোদ শিল্প'-এ মুনাফা ভালো আর গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ লোকসানের ব্যবসা। আমরা বিনিয়োগের 'এফিসিয়েন্সি'-র ভাষায় কথা বলি— যে বিনিয়োগে কম খরচে বেশি জিডিপি বাড়ে, সেটাই 'এফিসিয়েন্ট'। কিন্তু এই জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়নের কী সম্পর্ক? একটা ছোট্ট প্রবন্ধে এক

কথায় এর উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক ভাদুড়ি। পুঁজি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন বাড়াচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। এটা ঘটছে দুভাবে। এক, উৎপাদনবৃদ্ধির কাজটা করা হচ্ছে পুঁজি যেভাবে চায় সেভাবে। পুঁজি চায় পুঁজি সঞ্চয়ের (accummulation) গতি বৃদ্ধি করতে। এটা করার জন্য দরকার হয় উৎপাদনের একক প্রতি শ্রমের ব্যবহার কমিয়ে আনা। বাস্তবে এটা প্রতিফলিত হয় শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা (productivity) বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধিটা ঘটতে পারে দুভাবে। এক, উৎপাদনে যুক্ত শ্রমিকের শ্রমনিবিড়তা বাড়িয়ে, যেটা ঘটে একই সময়ে শ্রমিককে দিয়ে আগের তুলনায় বেশি কাজ করানোর মধ্য দিয়ে। সংগঠিত শিল্পে এটা ঘটানো হয় প্রযুক্তির উন্নতির সাহায্যে, যার নীট ফল হলো উৎপাদন যে হারে বাড়বে, শ্রমিক নিয়োগ বাড়বে তার তুলনায় কম হারে। এটার পোষাকি নাম 'নিয়োগহীন বৃদ্ধি' (jobless growth)। আর একটা উপায়েও এই সঞ্চয়বৃদ্ধির কাজটা করানো হয়। সেটা হলো, কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে, আর কাজ অনুসারে (piece rate) মজুরি দিয়ে। এটা প্রধানত করা হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যেখানে আছে বিপুল বেকার বাহিনী, পেটের দায়ে যে বাহিনীর সদস্যরা মুখে রক্ত তুলে বারো ঘন্টা কাজ করে চার হাজার টাকা বেতন নিয়ে বাড়ি যাবে। অধ্যাপক ভাদুড়ি উল্লেখ করেছেন, ভারতবর্ষে ইদানিং জিডিপি বৃদ্ধির হারে যে প্লাবন এসেছে, তার বড় অংশটাই এসেছে এইভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বাড়িয়ে অর্থাৎ শ্রমিক পিছু উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে।

যে উৎপাদনবৃদ্ধির চালিকা শক্তি পুঁজির সঞ্চয়হার বৃদ্ধির তাগিদ, তাতে উৎপাদনের সুফল 'আম আদমি'র কাছে যেতে পারে না। তবুও কিছুটা সামাল দেওয়া যেত, যদি রাষ্ট্র মাঝে দাঁড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল কিছুটা হলেও 'আম আদমি'র কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করত। পুঁজির চিরদিনই চায় উৎপাদন করানোর মধ্য দিয়ে পুঁজির সঞ্চয় বাড়াতে। সঞ্চয় বাড়ানোর প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে শ্রমনীতির ওপর আক্রমণ নামানোর উপাদান। পুঁজিকে যদি সংযত করা না হয়, এ আক্রমণের তীব্রতা ক্রমে বাড়তে থাকে। ঠান্ডা যুদ্ধ কিংবা তার কিছুটা আগের যুগে, অনেকটা সোভিয়েত বিপ্লবের ধাক্কায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এই পুঁজি সঞ্চয়ের নগ্ন আক্রমণের ওপর একটা ভদ্র পোষাক পরাবার কাজটা করত— শ্রম আইন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধি এসবের মধ্য দিয়ে যা বাস্তবায়িত হতো। সামাজিক অসাম্যও এর ফলে কিছুটা কমত। ইদানিং, সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী পৃথিবীতে, পুঁজি বে-পরওয়া হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রের ভূমিকাকেও নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। অধ্যাপক ভাদুড়ির ভাষায়, যেটা ঘটছে তাকে বলা যায় "ideo-logical rolling back of public expenditure in social services"। পুঁজি দেবে মজুরি, আর সেই মজুরির পয়সায় শ্রমিক কিনবে স্বাস্থ্য বিমা, কিনবে পেনশন, কিনবে সন্তানের শিক্ষা। রাষ্ট্র এর মাঝে থাকবে না। নীট ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে শ্রমিকের প্রকৃত আয় আগের তুলনায় কমছে, বাড়ছে অর্থনৈতিক ব্যবধান। শ্রম আইন শিথিল করা (বা তুলে দেওয়া) দাঁড়িয়েছে আর এক অস্ত্র; শ্রমিক এখন সংঘবদ্ধ হবে না, ফলত তার ওপর আক্রমণ তীব্রতর করা যাবে। সংঘবদ্ধ যাতে না হতে পারে, তার জন্য শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্র এখন ফিরে যাচ্ছে প্রাক-সোভিয়েত বিপ্লব যুগে, তার ভূমিকা এখন পুঁজির 'ফেসিলেটেটর'-এর ভূমিকা। পুঁজি আনবে গ্রোথ, ফলত বাড়বে জিডিপি। এটাকেই বলতে হবে উন্নয়ন। এই উন্নয়নের শিকার হবেন শ্রমজীবী মানুষ, পুঁজির সঞ্চয়ের বিপুল তাড়নায় বিপন্ন হবেন কৃষক, বিপন্ন হবেন মূলবাসী বা আদিবাসী যাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর সমাজ-স্বীকৃত অধিকার। এর নামই নয়া উদারবাদী উন্নয়ন, যেটাকে নিয়ে একটা কথাই বলার থাকে। অধ্যাপক ভাদুড়ির ভাষায় কথাটা হলো "let us call it a bluff"।

এই উন্নয়নের চেহারাটি কী, কীভাবে এই উন্নয়ন একটা সর্বব্যাপী আক্রমণ নামিয়ে আনছে সমাজ জীবনে, সংকলনভুক্ত এগারোটি রচনায় আছে তার বর্ণনা। অধিকাংশ প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট হলো ভারতবর্ষ, কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিটি প্রবন্ধই সুলিখিত, প্রতিটি প্রবন্ধই লেখা হয়েছে সংশ্লিষ্ট তথ্যের সুদক্ষ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। জনগণের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ কীভাবে এই আক্রমণের মুখে রাষ্ট্রীয় নীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ দান সংক্রান্ত ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধে সেটিও আলোচনা করা হয়েছে।

যেটি বেশি খুঁজবার চেষ্টা করছিলাম এই প্রবন্ধ সংকলনে তা হলো, যা চলছে তার বিকল্প কী হতে পারে, অর্থাৎ এই উন্নয়নের বিকল্প নিয়ে ভাবনা চিন্তা কী আছে সে সংক্রান্ত আলোচনা। এর কারণ অবশ্যই এই নয় যে পুঁজি-কেন্দ্রিক উন্নয়নের সমালোচনা হিসেবে যে প্রবন্ধগুলো এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি থেকে নূতন কিছু আহরণ করার নেই। পুঁজি-কেন্দ্রিক উন্নয়ন যে সমস্যা তৈরি করছে, তা বুঝতে এই প্রবন্ধগুলির প্রতিটিই পাঠ করা জরুরি। কিন্তু সূচনায় যে প্রস্তাব করা হয়েছে, এই 'উন্নয়ন'-এর বিকল্প খোঁজার প্রস্তাব, এই সংকলন সে বিষয়টিতে কী আলোচনা করল, সেটি জানার আগ্রহ ছিল প্রবলতর।

বর্ষীয়ান অর্থনীতিবিদ সৌরীন ভট্টাচার্যের প্রাগুক্ত প্রবন্ধটিতে এই বিকল্প অনুসন্ধান সম্পর্কে কিছু কথা বলা হয়েছে, যা প্রণিধান করা দরকার। উন্নয়ন আমরা চাই কেন? সাধারণ উত্তরটাই এ ক্ষেত্রে ঠিক উত্তর। উন্নয়ন চাই জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের আবশ্যক

পূর্বশর্ত কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে, এটা ঠিক নয়। জীবনযাত্রার মান কিছু সংখ্যা (যথা জিডিপি) দিয়ে বোঝানো যায় না, ওটা গুণগত বর্ণনা। যে মানুষ ভালো থাকে, সে জানে যে সে কত ভালো আছে। কিন্তু সে যাই হোক, এটা মনে রাখা দরকার, অর্থনীতি বিশেষত পুঁজিবাদী অর্থনীতি এই 'ভালো থাকা'র শর্ত পূরণ ক'রে উৎপাদন করে না। উৎপাদন সেখানে হয় মুনাফার জন্য আর মুনাফা কেন্দ্রিক উৎপাদনের সঙ্গে 'ভালো থাকা'র চাহিদা পূরণ সবসময় সাযুজ্যপূর্ণ হয় না। উন্নয়ন যদি 'ভালো থাকা'র কথা মনে রেখে উৎপাদনের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নির্বাচন করতে পারে, তবেই খুঁজে পাওয়া যাবে বর্তমান পুঁজিকেন্দ্রিক উন্নয়নের বিকল্প। 'ভালো থাকা'টা মাপা কঠিন, 'ভালো থাকা'র জন্য উৎপাদনের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নির্বাচন করাও কঠিন, কেন না এটা বিষয়ীগত (subjective)। কীভাবে এটা আনা যায় উন্নয়ন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে? অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে, এটা আনতে হবে ব্যক্তির ইচ্ছার মান্যতা দিয়ে; উৎপাদনের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আরও যেটা দরকার সেটা হলো সাংস্কৃতিক ও আত্মিক (spiritual) বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনা যাতে করে বাজার এবং মিডিয়া যে চাহিদা ক্ষেত্র তৈরি করে, গণতান্ত্রিক উপায়েই তার মধ্যেকার আবর্জনাগুলোকে দূরে সরানো যায়।

কথাগুলো খাঁটি কথা। অর্থনীতি, অর্থাৎ পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির টেক্সট বই-এর শুরুর জায়গাটাই হলো এক ভোক্তার অস্তিত্ব, যার আছে অনন্ত ভোগবাসনা (unsatiable consumption needs)। বাস্তবে এই ভোক্তার অস্তিত্ব না থাকলেও বাজার তার কাঙ্খিত এই ভোক্তাটি তৈরি করে সমস্ত সামাজিক মানুষের মনের জমিতে অনন্ত ভোগবাসনার চাষ ক'রে ক'রে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেন, বিদ্যমান উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল করতে হলে বন্ধ করতে হবে এই বাজার তাড়িত এই ভোগবাসনার চাষ-আবাদ। সেটার জন্য প্রয়োজন হবে উৎপাদনে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সামাজিক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে মর্যাদা দেওয়া আর সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মানোন্নয়নের চেষ্টা করা, যাতে কোন্‌টা আবশ্যক আর কোন্‌টা অনাবশ্যক সেটা বাজার-ব্যবস্থা মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতে না পারে।

এ থেকেই ওঠে উন্নয়নের সঙ্গে 'এথিক্‌স' বা নীতিশাস্ত্রের সম্পর্কের কথা। বিষয়টা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন রাজেশ ভট্টাচার্য এই সংকলনভুক্ত একটি প্রবন্ধে ('Ethics and Economics of Development')। প্রবন্ধটি এই কারণেও পড়া দরকার যে, উন্নয়ন নিয়ে যে বিতর্ক আছে তার একটা ভালো বর্ণনা পাওয়া যাবে রচনাটিতে, বিতর্কের জিনিওলজি বা বংশানুসারী বিবর্তন বুঝতেও প্রবন্ধটি একটি মূল্যবান ভূমিকা পালন করবে। অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যর প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধের যোগসূত্রের জায়গাটি এই যে, অধ্যাপক ভট্টাচার্য সামাজিক মানুষের যে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এই উন্নয়নের বিকল্প খুঁজবার জন্য, উন্নয়নের সঙ্গে 'এথিকস'-এর বিষয়টিকে জুড়ে রাজেশ ভট্টাচার্য সেটিরই যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে উন্নয়নভাবনা কী হওয়া উচিত সে দিকে নিয়ে গেছেন আলোচনাটিকে।

যে উন্নয়নভাবনা দিয়ে এই পুঁজিতাড়িত উন্নয়নভাবনাকে বিতাড়ন করতে হবে, অধ্যাপক রাজেশ ভট্টাচার্যর মতে সেখানে পশ্চিম থেকে আসা যাবতীয় অর্থনৈতিক মতবাদের কোনোটিরই স্থান নেই, কেন না পশ্চিম থেকে আসা যাবতীয় অর্থনৈতিক মতবাদ নীতিশাস্ত্র বা এথিক্‌স-এর ওপরে স্থান দিয়েছে বস্তুভিত্তিক প্রয়োজন (material needs) গুলিকে। এই বিষয়ে মার্কস এবং মার্শালে কোনো তফাত নেই। ফিরতে হবে মহাত্মা গান্ধীতে যেখানে অনন্ত ভোগবাসনার ওপর একটা নীতিগত সীমা টানার কথা বলা হয়েছে। নয়া উদারবাদের যুগে এই গান্ধীবাদী উন্নয়নের নির্দিষ্ট রূপটি হবে স্থানিক শক্তির ওপর জোর দেওয়া; স্থানীয়ভাবে যে জনগোষ্ঠীভিত্তিক সব নির্দিষ্ট মূল্যবোধ আছে, সেগুলোর মধ্যে আছে 'পুঁজি'চালিত 'উন্নয়ন' রুখে দেবার উপাদান। সেগুলোকেই প্রাধান্যে আনতে হবে। স্থানীয়ভাবে যে নীতিসিদ্ধ মূল্যবোধ দেখা যায়, আজকের যুগে সেই মূল্যবোধই পারে ভোগবাসনার ওপর লাগাম টানতে। কথাগুলো ইতিপূর্বে প্রণব বসু একটি রচনায় ('Politics of Land Grab', *EPW*, 2007) একভাবে উল্লেখ করেছিলেন। অধ্যাপক রাজেশ ভট্টাচার্য সে কথাগুলোই লিখেছেন (অবশ্যই স্বীকৃতিসহ), তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে এসে।

বাজার যে অনন্ত ভোগবাসনা তৈরি করে, স্থানিক সামাজিক জীবনের মূল্যবোধে কি তার ওপর সংযম আনার উপাদান আছে? আছে যে তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই। এগুলিকে রক্ষা করতে পারলে যে একটা সংযম শাসিত সমাজ গড়া যেতে পারে, তাতে সংশয় প্রকাশ করার কারণ নেই। আরও যোগ করা যায় যে মানুষের মধ্যে যে পরহিতবাসনা (altruism) আছে, সেটাও এই অনন্ত ভোগবাসনার ওপর লাগাম দেয়ার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক তত্ত্বে এই বিষয়টি বহু আলোচিত। মহাত্মা গান্ধী যে সংযম অভ্যাস করার কথা বলতেন, সেটাও নূতন কথা নয়। উপনিষদে যে তিন 'দ'-র কথা আছে তার একটা হলো 'দমন'— লোভ দমন (অন্য দুটি দয়া ও দান, একটা বাসযোগ্য সমাজ গড়ার জন্য যে দুটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় সর্বত্র)। গৌতম বুদ্ধ থেকে যাবতীয় ধর্মগুরু এ নিয়ে বহু ভালো কথা বলেছেন— আজও এ সব কথা বলার মতো মানুষের দেখা পাওয়া যায়।

তবু ঘটনা হলো, সমাজ চলে উল্টোদিকে। কৌম সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধ টেকে না, সাঁ সিমো-র বান্ধব সমাজ এখন ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র ফুটনোট। এর কারণ কী, সেটা খুঁজতে বিপুল তত্ত্বচর্চা করতে হয় না। গৌতম বুদ্ধ বা বেদের যুগে এসবে কাজ হয়নি কারণ অভাবতাড়িত সমাজে থাকত প্রবলের পীড়ন, যে অবস্থায় দমন আসত অবদমনের মাধ্যমে, সুযোগ পেলেই মানুষ যা ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করত। পুঁজির যুগে বিষয়টা অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু সারের দিক থেকে সমস্যাটা একই। পুঁজি নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু তার আছে প্রবল সঞ্চয় বাসনা (drive for accummulation)। এই সঞ্চয়বাসনা চরিতার্থ করার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র চলে তার অভিযান, সর্বত্র তাকে তৈরি করতে হয় 'বাজারি মানুষ' (economic man) যার থাকবে অনন্ত ভোগবাসনা। পুঁজি তৈরি করে সেই বাস্তব ভিত্তি, যার ওপর গড়ে ওঠে ভোগবাদী মানুষ। ভোগের অনন্ত সুযোগ সবার জন্য তৈরি হয় না, কিন্তু এই ভোগবাসনা ছড়ায় সর্বত্র। অন্য চেতনা, পাল্টা চেতনা, ভোগবাসনা দমন করার চেতনা কি থাকে না? থাকে অবশ্যই, তবে তার বাস্তব ভিত্তি দুর্বল থাকে; পুঁজিবাদী চেতনা গড়ার বাস্তব ভিত্তি থাকে প্রবলতর; এতটাই প্রবল থাকে এই চেতনা যে এমনকি প্রাচীন কৌম সমাজের অভ্যাসকেও সে নষ্ট করে দিতে পারে। পাল্টা চেতনা, যা দুর্বল থাকে সেই চেতনা কি প্রবলতর সামাজিক চেতনায় পরিণত হতে পারে? যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর হলো, সেটা সম্ভব, যদি প্রবলতর চেতনার যে বাস্তব ভিত্তি, সেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা উৎখাত করার লক্ষ্যে এই চেতনা পরিচালিত হয়। যাঁরা বলেন, স্থানিক শুভচেতনাগুলিকে জোরদার করেই এই 'উন্নয়ন' রুখে দেওয়া যাবে, অথবা যাঁরা বলেন সংযমের উন্নততর সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে এই 'উন্নয়ন'-এর পাল্টা উন্নয়ন কার্যকর করা যাবে, তাঁরা সম্ভবত এই বিষয়টি খেয়াল করেন না যে প্রবলতর চেতনার যে বাস্তব ভিত্তি সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাত করার কাজটি এক্ষেত্রে অনেক বেশি জরুরি কাজ; চেতনার যেহেতু থাকে বস্তুগত ভিত্তি, ভিত্তি দুর্বল করেই এই পাল্টা চেতনাকে পরাজিত করার যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব।

'উন্নয়ন' বিতর্কে কথাটা তাই উঠবে, কোন্ পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে এই পুঁজিকেন্দ্রিক উন্নয়নকে রুখে দেওয়া সম্ভব, সেটা বিবেচনা করা। সাঁ সিমোর মতো বান্ধব সমাজ গড়ার প্রকল্প? মৎস্যজীবী সমবায় গড়া? কৌম সমাজ রক্ষার চেষ্টা করা? ইতিহাসে এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা কিছু কম হয়নি। এ সবই ব্যর্থ হয়েছে বাঞ্ছিত ফল অর্জনে। বলা যেতে পারে, বাঞ্ছিত ফল অর্জনে ব্যর্থ হলেই একটা প্রকল্প বাতিল ঘোষণা করা উচিত নয়। দেখতে হবে, কেন এসব টেকেনি? না টেকার প্রধান কারণ, এগুলো পুঁজিবাদী সমাজকে এড়িয়ে গিয়ে অন্য কিছু করতে গেছে, কিন্তু পুঁজি এই এড়িয়ে যাবার কাজটাই করতে দেওয়নি, সবগুলিকেই সে নিজের নিয়মে বেঁধে ফেলেছে। এ থেকে যুক্তিসিদ্ধ যে সিদ্ধান্ত করা উচিত তা হলো, এ সব টেকাতে হলে বা বিকল্প কিছু করতে হলে আসলে ভাঙতে হবে পুঁজির শাসন। পুঁজির 'উন্নয়ন'কে ভেঙ্গে দিয়ে নিতে হবে একটা 'পুনর্গঠন'-এর কর্মসূচি। 'উন্নয়ন'-এর বিকল্প অন্য 'উন্নয়ন' নয়, 'উন্নয়ন'-এর বিকল্প 'পুনর্গঠন'। কী থাকবে এই 'পুনর্গঠন'-এর এজেন্ডায় সেটা আলোচনা করাই এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। বর্তমান সমালোচকের মতে এই প্রয়োজনীয় কাজটি অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে করা হয়েছে সংকলনের শেষ প্রবন্ধে, যার লেখক হলেন এই সংকলনের সম্পাদক নীলাঞ্জন দত্ত। নীলাঞ্জন দত্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রয়াত অজিতনারায়ণ বসুর একটি স্বল্প প্রচারিত রচনার কথা যেখানে 'উন্নয়ন' শব্দটিকে হটিয়ে দিয়ে আনা হয়েছে 'পুনর্গঠন' শব্দটি। পুনর্গঠনের মূল উপাদান চারটি। প্রথমত, অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে যা উৎপাদন করা দরকার, সেগুলি চিহ্নিত করা। অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্যর সঙ্গে একমত হয়েই বলা যায়, এই উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি নির্বাচন করা দরকার গণতান্ত্রিক উপায়ে। যোগ করা যায় এই কথাটা যে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন-এর ক্ষেত্রগুলি নির্বাচনে মতপার্থক্য থাকবে কম, গণতন্ত্র এখানে আনবে (প্রায়) সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় উপাদান হলো প্রযুক্তি নির্বাচন। প্রযুক্তি নির্বাচন করতে হবে পুঁজির সঞ্চয়ের তাগিদ থেকে নয়, এটা করতে হবে সমাজে যে বিদ্যমান শ্রমশক্তি তার পূর্ণ ব্যবহারে লক্ষ্যে। সবাই কাজ পাবে, সবাই সানন্দে কাজে অংশগ্রহণ করবে— এটাই প্রযুক্তি নির্বাচনের আশু লক্ষ্য। এ থেকেই আসবে পরিবেশবান্ধব, স্বনির্ভর এক টেকসই অর্থনীতি যা প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে পারে সব শ্রমদাতাকে কাজে লাগিয়ে। পুঁজি 'উৎপাদন দক্ষ' থাকল কিনা সেটা এই নিযুক্তির আশু আলোচ্য বিষয় নয়। এ থেকেই আসে এই পুনর্গঠনের তৃতীয় উপাদানের কথা। এই উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা অর্জন নয়, এই পুনর্গঠনের লক্ষ্য হবে শ্রম সহ যাবতীয় সামাজিক সম্পদের এমন একটা নিয়োগ ব্যবস্থা যা সামাজিক মানুষের আশু এবং গুরুতর প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারে।

'গণতন্ত্র' এবং রাষ্ট্রের বিষয়টা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজটাই সোভিয়েত করতে গিয়েছিল রাষ্ট্রকে সামনে রেখে। সেটা শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছিত লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়। অজিত নারায়ণ বসুর মতে, এ সমস্যাটার মোকাবেলা করতে হবে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে অবিচল থেকে গণতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রসারিত করে— যে গণতন্ত্রের কথা সৌরীন ভট্টাচার্যও বলেছেন। পুনর্গঠনে গণতন্ত্র রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় এই পুনর্গঠনের কাজটাই বিকেন্দ্রীভূত করে দেওয়া। স্থানীয় এলাকায় থাকবে স্বশাসন, এলাকাগুলি (প্রায়)

স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়বে। এই স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ার কাজটা করবে স্থানীয় শ্রমজীবীদের স্বাধীন সংস্থাগুলো। এই সংস্থাগুলোই হবে নয়া রাষ্ট্রের বুনিয়াদি উপাদান। চেহারাটা অনেকটা দাঁড়াবে পঞ্চায়েত, ওয়ার্ড কমিটি, কারখানা সমবায়, সেবাসংস্থা-সমবায়- এই সব রাষ্ট্র-স্বীকৃত সংস্থা, সাংবিধানিকভাবে যেগুলি হবে রাষ্ট্রের একটা স্তর যার হাতে থাকবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা। উপরের স্তরগুলো এগুলোর সমন্বয় সাধন করবে এবং কাজ কম থাকায় এদের ক্ষমতাও কম থাকবে। এভাবেই তৈরি হবে পুনর্গঠিত সমাজ ও তার শাসন ব্যবস্থা।

নীলাঞ্জন দত্তকে ধন্যবাদ। উন্নয়ন বিতর্কে অজিতদার তৈরি করা এই ইসতেহারটির প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, সেটিকে তিনি অল্প কথায় খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছেন এই সংকলনটির শেষ লেখাটিতে। অজিতদার লেখাটির প্রাসঙ্গিকতা বোঝাতে তিনি 'ক্যাপিটাল'-এর ১৮৮৬ সালের সংস্করণের সূচনাপত্রে এঙ্গেলস যা লিখেছিলেন তার একটি অংশ উল্লেখ করেছেন তাঁর রচনার শেষাংশে। আমার ধারণা, বর্তমান উন্নয়ন বিতর্কে সেই কথাগুলোও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা অন্য পন্থা খোঁজেন, তাঁদের অন্য শব্দও ব্যবহার করতে হবে নিজেদের কথাগুলো বলার জন্য। অজিতদার ইসতেহারে 'পুনর্গঠন' শব্দটির ব্যবহারকে এই দিক থেকে বিচার করতে হবে। যোগ করব এই কথাটা যে এই অন্য শব্দ ব্যবহার শুধু কী করতে হবে সেটা বোঝায় না, উন্নয়ন'-তাড়িত বর্তমান অর্থনীতির বিকল্প খোঁজার মতাদর্শগত তাগিদও জোরদার করে এই ভিন্ন শব্দটি।

শেষ কথা হিসেবে সংযোজন করব এই বক্তব্য যে এই 'পুনর্গঠন'-এর অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্য এক রাজনীতি— পুনর্গঠন করা যায় এমন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে আসার রাজনীতি। যাঁরা উন্নয়ন বিতর্কে যুক্ত আছেন, তাঁদের সবাইকে এটা বুঝতে হবে এবং রাজনীতি বিবর্জিত অর্থনীতি চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। এটাও আসলে একটা পুনর্গঠনের কাজ— মস্তিষ্ক পুনর্গঠন। এ কাজটা বাদ দিয়ে কোনো 'পুনর্গঠন'ই যে করা যায় না এটা যত দ্রুত উপলব্ধি করব আমরা, এক বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার কাজটা ততই সহজতর হয়ে উঠবে। নীলাঞ্জন দত্তকে অনুরোধ, তিনি আর একটা বই সম্পাদনা করুন, যাতে এই 'পুনর্গঠন' হবে কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। আমার অনুমান, সেটা করলে পুনর্গঠনের রাজনীতি নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনাগুলোও এক মলাটের মধ্যে নিয়ে আসা যাবে অনেকটাই। লাভবান হব আমরা, যারা চাই পুনর্গঠনের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে যে রাজনীতি সেই রাজনীতিটিও বুঝতে।

Beyond Development: Nilanjan Dutta (ed.), Shreya Pulications, Kolkata, pp. 240, Price - Rs 300



**কবিতা**

## স্বপ্ন দেখার গল্প

**দেবব্রত কর্ম্মকার**

শচীবাবু—
একদিন আপনি
এই মেঘরাঙা নদীর কলতান শুনতে শুনতে
জলছাপে দেখেছিলেন—
কতকগুলি অপূর্ব সাদা পাখি
কেমন করে নদীর উজানে মারছে টান!

সেই সব দুধ-সাদা পাখিরা,
সেই সব স্বপ্নের পাখিরা
কেউ কেউ নীলিমার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
দিগন্তে ছড়িয়েছিল
সীতাশাল ধানের অপূর্ব সুগন্ধি!

শচীবাবু—
এ গল্প আমার পিতামহও শুনিয়েছিল।
আশি বছরের মুক্তি টুডু
এখনো আপনার মতো
ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে
সেই সব অচিন পাখিদের স্বপ্ন দেখে—

স্বপ্ন দেখে—
মিছিলে, মিটিঙে, কান্নায়, বেদনায়,
বিক্ষোভে, জলসায়,
মানুষের দুঃসময়ে
সেই সব শ্বেত-ধবল পাখিরা
এক একটা এক এক রকম পালকে
মোলায়েম সুখস্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে
হৃৎপিণ্ডের ক্ষতে!

শচীবাবু—
শীতল বাষ্পমাখা জলদবরণী আকাশ
তাদের কাছে এলে
ভরে যেত সৃজনী বাহারে।

তারপর—
সাদা পাখিদের পুড়ে যাওয়া কঙ্কালে
ছুঁয়ে গেছে অনেক রাত্রির অন্ধকার!

এখন শুধু,
আমাদের ফেউ হয়ে বেঁচে থাকা!

শচীবাবু: বাঁকুড়া জেলার অন্যতম কবি 'সচ্চিদানন্দ হালদার'